# নাস্তিকতার অসারতা

[ আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে নাস্তিকদের অভিযোগ সমূহের সহজ উত্তর ]

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

# ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام علي سيد لأنبياء والمرسلين أما بعد........

যারা কোনো সৃষ্টিকর্তাতে বিশ্বাস করে না তাদের বলা হয় নাস্তিক। আরবীতে এদের আল ইলমানিয়্যাহ্‌ (العلمانية), আদ্‌ দাহরিয়্যাহ (الدهرية), ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে কিরাম এই ধরণের লোকদের উদ্দেশ্যে যিনদীক নাম ব্যাবহার করতেন। যদিও যিনদীক ও নাস্তিক এর মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে তবে কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ( القول بأزلية العالم) “পৃথিবীকে কেউ সৃষ্টি করেনি এমন ধারণায় বিশ্বাস করা” [মু’জামুল ওসীত]। সহজ কথায় মহাবিশ্বের কোনো স্রষ্টা থাকতে পারে এমন ধারণা পুরোপুরি অস্বীকার করা, অল্প জ্ঞান নিয়ে আল্লাহ ﷻ ও তার বিধি বিধানের উপর বিভিন্ন প্রকার আপত্তি অভিযোগ উপস্থাপণ করা, যে পর্যন্ত মানুষের বোধ শক্তি পৌছায় না সেসব বিষয় নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা ইত্যাদি কাজই  নাস্তিকদের প্রধান বৈশিষ্ট।

কোরানে কারীমে এদের সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ} [الحج: ٨]

❮ মানুষের মধ্যে একদল লোক আছে যারা কোনোরুপ জ্ঞান ও প্রমান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে। ❯ [হাজ্জ/৮]

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

{تفكَّروا فی خلق الله ولا تفكروا فی الله}

❮ তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করো আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা করো না। ❯

[জামিউল আহাদীস]

{لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ}

❮ মানুষ একের পর এক প্রশ্ন করতেই থাকবে এমনকি এক সময় তারা বলবে আল্লাহ্ তো সব কিছু সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তাকে কে সৃষ্টি করেছে? [নাউযু বিল্লাহ] ❯

[সহীহ আল বুখারী]

আমরা বর্তমানেও এক শ্রেণীর লোকদের আল্লাহ ﷻ ও তার দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন রকম উদ্ভট প্রশ্ন করতে শুনি। এসকল নাস্তিকরা মনে করে তাদের প্রশ্নগুলো এতটাই জটিল যে তার সমাধান করা অসম্ভব। তারা যেসব প্রশ্ন করে তার মধ্যে প্রধান প্রশ্নগুলো হলো,

**(১)** আল্লাহ ﷻ কে দেখা যায় না, পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভবও করা যায় না। যা কিছু দেখা যায় না বা পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না তার উপর বিশ্বাস স্থাপণ করা অযৌক্তিক। [নাউযু বিল্লাহ]

**(২)** যখন তাদের বলা হয় আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন মাটি থেকে গাছ গাছালি বের করেন। তারা বলে কিভাবে সমুদ্র হতে পানি বাষ্প আকারে আকাশে গমণ করার পর মেঘ হতে তা আবার বর্ষিত হয় সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছে একইভাবে সৃষ্টি রহস্যের বহু গুপ্ত তথ্য এখন উদঘাটিত হয়েছে যেসম্পর্কে এখনও জানা সম্ভব হয়নি সেগুলো অচিরেই প্রকাশিত হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রকৃতির রহস্য সম্পর্কে যখন আমরা জানতে পেরেছি তখন এগুলোর পিছনে কোনো স্রষ্টার অবদান কেনো স্বীকার করবো? [নাউযু বিল্লাহ]

**(৩)** তারা বলে একজন সর্বশক্তিমান স্রষ্টার অস্তিত্ব একটি অসম্ভব ব্যাপার কারণ যদি মেনে নেওয়া হয় তিনি সব কিছু করতে পারেন তবে প্রশ্ন হলো তিনি কি এমন একটি পাহাড় তৈরী করতে পারেন যা তিনি নিজেই নাড়াতে সক্ষম নন? যদি এর উত্তর না বোধক হয় তবে তিনি অক্ষম প্রমানিত হন কারণ তিনি এমন একটি পাহাড় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন। আর যদি এর উত্তর হ্যা বোধক হয় তবে তিনি অক্ষম প্রমানিত হন কারণ তিনি পাহাড়টি নাড়াতে সক্ষম নন। [নাউযু বিল্লাহ]

**(৪)** তারা বলে যদি বলা হয়, সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে তার ইচ্ছার বাইরে কিছুই ঘটে না তবে প্রশ্ন হলো একজন পাপী যখন পাপ কাজে লিপ্ত হয় সেটা কি আল্লাহর ইচ্ছায় হয়? যদি এর উত্তর না বোধক হয় তবে আল্লাহ অক্ষম প্রমানিত হন কারণ তার সৃষ্টিরই একজন তার ইচ্ছার বাইরে কাজ করছে আর যদি এর উত্তর হ্যা বোধক হয় তবে একজন পাপী কেনো শাস্তি পাবে? সে তো আল্লাহর ইচ্ছাতেই পাপ কাজ করছে। [নাউযু বিল্লাহ]

**(৫)** তাদের সর্বশেষ অস্ত্র হলো যখন বলা হয় আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তারা বলে আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টি

করেছেন তাহলে তাকে কে সৃষ্টি করলো বা তিনি কিভাবে অস্তিত্বে আসলেন? [নাউযু বিল্লাহ]

এগুলোই নাস্তিকদের মূল প্রশ্ন। এছাড়া আর যেসব প্রশ্ন তারা করে থাকে তা এই প্রশ্নগুলোর কাছাকাছি। এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর জেনে নিলে একজন মুসলিমের জন্য নাস্তিকদের ফিতনা হতে আশ্রয় পাওয়া সহজ হবে বলে আশা করি। স্বাভাবিক বিবেচনায় প্রশ্নগুলো জটিল মনে হলেও এর সহজ উত্তর রয়েছে। সাধারন বুদ্ধির মাধ্যমেই এগুলোর সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব। শুধু আমাদের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ঘটনাদির উপর চিন্তাগবেষণা করলেই এগুলোর জট খুলে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমরা কিছু গল্পের মাধ্যমে এগুলোর উত্তর খুজে পাওয়ার চেষ্টা করবো।

(১)

## নাস্তিকতার যৌতিকতা।

একজন ধার্মিক একবার এক নাস্তিককে তিরষ্কারের স্বরে প্রশ্ন করে,

- আচ্ছা জনাব, আপনি যে আল্লাহ কে বিশ্বাস করেন না এর কারণ কি?

নাস্তিকটি বলে,

জনাব, আল্লাহকে কি দেখা যায়?

আস্তিকজন বলেন,

আপনি কি বাতাসের আস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না? বাতাস তো দেখা যায় না।

- দেখুন জনাব, বাতাসকে দেখা যায় না কিন্তু তা গায়ে লাগে। অনুভব করা যায়।

নাস্তিকের এই জবাবে ধার্মিক লোকটি মুচকি হেসে মাথা নাড়েন। তারপর বলেন,

- উত্তম। আপনি কি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে বিশ্বাস করেন? এটা কি দেখা যায় বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায়?

নাস্তিকটিও এর উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। পাকা

পণ্ডিতের ভঙ্গিতে বলে,

- আমরা দুটি কারণে মাধ্যকর্ষণ শক্তিতে বিশ্বাস করি।

প্রথমত এটা দেখা যায় না বা পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না কিন্তু অন্য জিনিষের উপর চিন্তা গবেষণা করলে এর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ যে দেখুন গাছের ফল মাটিতে পড়ে। চাঁদের টানে জোয়ার ভাটা হয়। বুঝতে পেরেছেন?

- জী বুঝতে পেরেছি আপনার দ্বীতিয় কারনটি কি?

- দ্বীতিয় কারনটি হলো যদিও এবিষয়ে আমরা সরাসরি গবেষণা করিনি কিন্তু বহু সংখ্যক বিজ্ঞানী এর পিছনে বহু সময় ব্যয় করেছেন। তাদের গবেষণায় এটা প্রমানিত হয়েছে। তারা যা বলেছেন আমরা তা বিশ্বাস করেছি।

ধার্মিকটি খুশি হয়। নম্রভাবে বলেন,

- আমরাও উক্ত দুটি কারনেই আল্লাহকে বিশ্বাস করি। আল্লাহকে দেখা যায় না। তাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না। কিন্তু এই পৃথিবী আর এই সুশৃঙ্খল সৃষ্টিরাজীর উপর চিন্তা গবেষণা করলে তার অস্তিত্ব

প্রমাণিত হয়।

দ্বীতিয় কারণ হলো আমরা নিজেরা অনেক কিছু দেখিনি কিন্তু নবী রাসুলরা দেখেছেন, তারা বলেছেন, আমরা তাদের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। সুতরাং আপনি যে দুটি কারণে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে বিশ্বাস করেন একই যুক্তিতে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমানিত হয়।

নাস্তিকটি এবার ভিন্ন রাস্তা ধরে। আত্মরক্ষার স্বরে বলে,

- তাহলে তো জনাব আমি আর আপনি সমান হয়ে গেলাম।

আস্তিকটি মাথা নেড়ে বলে,

- সমান কিভাবে? আমি তো দুটোকেই বিশ্বাস করি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকেও মানি আর আল্লাহকেও মানি কিন্তু আপনি তো একটিকে মানছেন অন্যটিকে অস্বীকার করছেন অথচ একই যুক্তিতে দুটিই প্রমানিত। আপনার এই দ্বীমুখিতা কি অযৌক্তিক নয়?

(২)

## নাস্তিকদের ভৌতিক যুক্তি।

অন্যান্য দিনের মতই সারাটা দিন খেলা করে সূর্যাস্তের পর গুন গুন করে গান গায়তে গায়তে বাড়ি ফেরে ভোলা। কিন্তু আজকের সন্ধ্যাটা খুব বেশি সুখকর হলোনা। রাখালরা যে লাঠি দিয়ে সারাটা বিকাল গরু পেটায় সেই লাঠি হাতে ভোলার বাবা দরজার কাছে অপেক্ষা করছিলেন। পালাবার কোনো সুযোগ নেই। একেবারে বাবার হাতের নাগালে পড়ে গেছে ভোলা।

বাঘ যেমন থাবা দিয়ে শিকার ধরে সেভাবে বিদ্যুতের গতিতে ভোলাকে পাকড়াও করে গরুপিটুনি দিলো আবুল হোসেন।

আজ যে প্রায়মারী স্কুলের ফলাফল বের হবে ভোলা তা বেমালুম ভুলে বসেছিল। মনে থাকলে কি আর আজ বাড়ি ফিরতো। পরীক্ষার খাতায় ঠিক কতোগুলো গোল্লা

পেয়েছে তা এখনও বলা যাচ্ছে না। তবে যা ঘটলো তাতে অনুমান করা যাচ্ছে নিশ্চয়। পরদিন সকালে ভোলার উপর কড়া নির্দেশ দেওয়া হলো রাশিয়া থেকে যুক্তির উপর ৫২ কাস পাশ করে আশা যুক্তিবাবুর কাছে প্রাইভেট পড়তে যেতে হবে।

অপছন্দ হলেও কিছুই করার নেই। ভোলা বই-পত্তর নিয়ে যুক্তিবাবুর পাঠশালার দিকে রওনা হয়।

পাঠশালা তো নয় এটা একটা গরুর গোয়াল। রাখালরা যখন গরুগুলো মাঠে চড়তে নিয়ে যায় ঠিক তখন যুক্তি বাবু একপাল ছেলেপুলে নিয়ে বসেন এখানে। ছেলেপুলে গুলোকে তিনি যুক্তি শিক্ষা দেন।

তিনি বলেন,

- নিজে চোখে না দেখে কিছুই বিশ্বাস করা যাবে না। বুঝেছো?

অন্য কেউ না বুঝলেও ভোলা কিন্তু বিষয়টি বুঝতে পারে। স্কুলের পড়াশুনা খুব একটা মজা না লাগলেও যুক্তিবাবুর যুক্তিপূর্ণ আলোচনা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুক্তিবাবুর গোয়ালঘরে সে নিয়মিত যাওয়া আসা করতে থাকে।

আবুল হোসেন সেদিন হাট থেকে বাড়ি ফিরেই ভোলার ব্যাপারে পাড়া-প্রতিবেশীর বিভিন্ন অভিযোগ শুনতে পেলো। সে নাকি আল্লাহ-আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই বিশ্বাস করেনা! তিনি ভোলাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে সে সাফ বলে দেয়,

- আমি না দেখে কিছুই মানতে প্রস্তুত নই।

আবুল হোসেন তাকে কিছুই বলে না। পাড়া প্রতিবেশীরাও চলে যায়।

পঞ্চম শ্রেনীতে উত্তীর্ণ না হলেও যেভাবেই হোক ভোলাকে হাই স্কুলে ভর্তি করতে হবে। আবুল হোসেন হাই স্কুলের হেড মাস্টারের বাড়িতে যাওয়া আসা শুরু করে। দুইশ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটা মোটা কাতলা মাছ কিনে একদিন মাস্টার সাহেবের বাড়ি গেলে তিনি বেজায় খুশি হলেন। বারবার করে বলে দিলেন ভোলাকে নিয়ে আগামীকাল স্কুলে দেখা করতে। সেই মোতাবেক ভোলাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মনিরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হাজির করা হলো। হেড স্যারের রুমে গিয়ে বসতেই তিনি বললেন,

বাহ! খুবই সুন্দর ছেলে তো! তোমার নাম কি?

ভোলা কোনোরুপ সংকচ না করে বলে,

- আমার নাম ভোলা।

হেড স্যার আবার বলেন,

- তোমার বাবার নাম কি?

হেড স্যারের কথায় ভোলা এমন ভাব করে যেনো কঠিন সমস্যায় পড়ে গেছে।

হেড স্যার আবার বলেন, তোমার বাবার নাম কি?

ভোলা এবার নিচের দিকে তাকিয়ে বলে,

- আমি জানি না স্যার।

হেড স্যার ঘনো ঘনো ঢোক গিলতে শুরু করেন। লজ্জায় আবুল হোসেনের মাথাকাটা যায়। আফিসভর্তি লোকের সামনে তাকে আজ গাধা বনে যেতে হলো!

হেড স্যার আবুল হোসেনের দিকে ইশারা করে আমতা আমতা করে বলেন,

- এই লোকটির নাম কি?

ভোলা সাথে সাথেই বলে,

- উনার নাম আবুল হোসেন।

হেড স্যার এবার একটু স্বাভাবিক হয়ে বলেন,

- এই লোকটাই কি তোমাকে জন্ম দেয় নি?

ভোলা পণ্ডিতের মতো ভাব করে বলে,

- আমি কি সে সময় উপস্থিত ছিলাম যে জানবো? আমি যা দেখিনি তা কিভাবে বলব?

আবুল হোসেনের ধৈর্যের বাধ ভেঙে যায়। চুলের গোছা শক্ত করে ধরে টানতে টানতে ভোলাকে আফিসরুম থেকে বের করে পিটাতে পিটাতে হাজির করে যুক্তিবাবুর পাঠশালায়। বাবু তখনও কয়েকজন ছাত্রকে যুক্তির মহামন্ত্রে দীক্ষিত করছিলেন। আবুল হোসেন চিৎকার করে বলে,

- এই হতচ্ছাড়াকে আপনি কি শিক্ষা দিয়েছেন শুনি, এসব ভৌতিক যুক্তি শেখালে মানুষের বাবা মার পরিচয় কি ঠিক থাকবে হ্যা? আপনার নিজের বাবা কে তা কি আপনি বলতে পারবেন? আপনার বাবা যখন আপনাকে

জন্ম দেয় তখন কি আপনি নিজে চোখে তা দেখেছেন?

যুক্তিবাবু এবার আত্মপক্ষ সমর্থন করেন,

- আমার জন্ম পরিচয় ঠিকই আছে জনাব। আমি স্পেশালিষ্ট দিয়ে ডি, এন, এ টেস্ট করে জেনে নিয়েছি।

আবুল হোসেন গরুর মতো হা করে কিছু একটা বলার জন্য কিন্তু তার আগেই ভোলা বলে,

- স্পেশালিষ্ট দিয়ে টেস্ট করলে হবে না। নিজে ডি, এন, এ টেস্ট করতে হবে। নিজে স্পেশালিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আপনার বাবার পরিচয় দিতে পারবেন না। বুঝেছেন?

যুক্তিবাবু এবার বোকা বনে যায়। নিজের যুক্তির ফাঁদে নিজেই আটকা পড়ে নিজের অজান্তেই বলে ওঠে,

- এ দেখি ভৌতিক কাণ্ড!!!

**(৩)**

## অংকের মধ্যে নাস্তিকতা।

জেলার মধ্যে সব থেকে বড় গ্রাম শুভপুর। জেলাতে যে তিনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে তার মধ্যে শুভপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় অধিক প্রশিদ্ধ। আশে পাশের কয়েক ক্রশ পর্যন্ত দূর থেকে ছেলেরা এখানে বিদ্যা অর্জন করতে আশে। বার্ষিক ফলাফল ও শিক্ষকদের নিষ্ঠার দিক হতে স্কুলটির যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। এই স্কুলের ছাত্ররা মেধাবী ও ধার্মিক। কেবল দু-তিন জন ছেলে আছে যারা দুটি রেকর্ডকেই ভঙ্গ করেছে। একই সাথে তারা নির্বোধ ও নাস্তিক। মাঝে মাঝেই এর ওর সাথে আল্লাহ্ ও ইসলাম নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে। একারণে হেড স্যার তাদের জনসম্মুখে ডেকে নিয়ে কয়েকবার উত্তম মাধ্যম দিয়েছেন কিন্তু কথায় বলে "সাপ না মরা পর্যন্ত সোজা হয় না"। হেড স্যার অনেক চেষ্টা করেও এদের সুশিক্ষিত করতে সক্ষম হননি। হঠাৎ একদিন এরা তিনজন হৈ চৈ করে হেড স্যারের রুমে ঢুকে পড়ে। সেখানে তখন অন্য কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিল। ব্যাপার কি প্রশ্ন করতেই তারা বলে,

- আমাদের যে অংক শেখানো হয় তাতে ভুল রয়েছে।

ব্যাপারটির গুরুত্ব অনুভব করে শিক্ষকরা নড়ে চড়ে

বসেন। হেড স্যার অবাক হয়ে বলেন,

- কিভাবে?

ঐ সকল নাস্তিকদের মধ্যে যাকে প্রধান পণ্ডিত হিসাবে কল্পণা করা হতো তার নাম ছিলো সুমন। শিক্ষকরা অবশ্য তাকে গুল্লা বলে ডাকতেন। এর দুটো কারণ আছে, প্রথমত প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় সে অধিক সংখক শুন্য অর্জন করতো দ্বিতীয়ত পরীক্ষায় ফেল করার সাথে সাথে রসোগোল্লা নিয়ে শিক্ষকদের বাড়িতে যাওয়া আসা শুরু করতো। মুলত এই দুটি কারণেই শিক্ষকরা তাকে গুল্লা বলে ডাকতেন। যাই হোক, সে এগিয়ে এসে বলে,

আমরা তিনজন লোক একেক জনের দুটি করে কান রয়েছে। তিনের সাথে দুই গুন করলে হয় ৬ সেই হিসাবে আমাদের সবার কান গণনা করলে তার সংখা ছয় হওয়ার কথা কিন্তু আমরা সবাই সবার কান গণনা করে পাচ্ছি চারটি। এটা কি অংকের ভুল নয়?

হেড স্যার ব্যাপারটি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করলেন। অন্যান্য শিক্ষকরাও ভীষণ অবাক হলেন। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন জামসেদ স্যার। তিনি

সুমনদের ক্লাসের অংকের শিক্ষক। তার মুখও হলুদ হয়ে গেছে। তিন জনের কান কিভাবে চারটি হয় সেটা নিয়ে চিন্তা করছেন। খুব বেশিক্ষণ চিন্তা না করে ওদের দিকে ফিরে বললেন,

গুনে দেখা তো দেখি?

ওরা তিন জন পরষ্পরের দিকে তাকিয়ে নিজেদের কান গণনা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। প্রথমে সুমন গণনা করে। দেখা গেলো সে নিজের কান বাদ দিয়ে অন্য দুজনের কান গণনা করেই থেমে গেল ফলে কান সংখা হলো চারটি। এভাবে অন্য দুজনকে গণনা করতে দেওয়া হলে তারাও নিজেদের কান বাদ দিয়ে গণনা করলো ফলে সবার ফলাফল একই হলো। শেষে সুমন নিশ্চিত করার জন্য আবার গণনা করলো এবারও নিজের কানদুটি বাদ দিয়ে গুনলো।

জামসেদ স্যার এবার বেত হাতে তেড়ে আসলেন। দুহাত দিয়ে সুমনের দু-কান ধরে ভীষণ জোরে টান দিয়ে বললেন,

এই দুটি কি? এ দুটো গুনেছিস?

জামসেদ স্যারের কথা শুনেই সবাই বুঝতে পারে ভুলটা কোন জায়গায় হয়েছে। জিভে কামড় দিয়ে বলে,

- ওটা দেখতে পায়নি তো তাই গুনতে ভুলে গিয়েছি।

হেড স্যার শব্দ করে হেসে বললেন,

- না দেখে কিছুই বিশ্বাস না করার ফলাফল যে কোন পর্যায়ে গিয়ে দাড়ায় তা এই সব গাধাদের কান গণনা দেখে স্পষ্টই টের পাওয়া যাচ্ছে।

জামসেদ স্যার বেত দিয়ে সবাইকে পিটাতে পিটাতে বললেন,

অংকের মধ্যেও নাস্তিকতা? তোমাদের নাস্তিকতার বারোটা বাজিয়ে দেবো।

**মন্তব্যঃ**

..............................................

এই গল্পগুলোর মধ্যে শিক্ষনীয় বিষয় হলো কোনো কিছু নিজে চোখে দেখা বা পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব না করা

ছাড়া সেটার উপর বিশ্বাস স্থাপণ না করার যে মতবাদে নাস্তিকরা বিশ্বাসী তা সঠিক নয়। আমাদের বাস্তব জীবনেও আমরা ঐ ধরনের নীতির উপর নির্ভর করি না। এর কারণ হলো মানুষের জ্ঞান সীমিত। একজন মানুষ সরাসরি নিজ চোখে নিজের কান পর্যন্ত দেখতে সক্ষম নয়। প্রকৃতিতে ঘটমান এমন অনেক বিষয় রয়েছে মানুষ যে বিষয়ে পুরোপুরি অন্ধকারে রয়েছে। জ্ঞানী ব্যাক্তি মাত্রই স্বীকার করেন যে তিনি যা জানতে পেরেছেন তা মহা সমুদ্রের সমুদ্র হতে উত্তলোন করা এক ফোটা পানির চেয়েও নগন্য। আল্লাহ বলেন,

{وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا } [الإسراء: ৮৫]

﴾ তোমাদের যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা অতি অল্প। ﴿
[সূরা ইসরা/৮৫]

সুতরাং যে নিজের জ্ঞান ও বোধের বাইরের সব কিছুকে অস্বীকার করে সে সুবিশাল একটি জগতকে অস্বীকার করে। তার উদাহরণ এক ব্যাক্তির মতো যে জন্ম থেকে অন্ধ। সে ভাবে সকল মানুষই তার মতো অন্ধ। বাবা-মা, পাড়া-প্রতিবেশী সকলে মিলেও তাকে একথা বোঝানো যায় না যে অন্য মানুষের দুটি চোখ আছে যা দিয়ে লাল,

নীল, হলুদ বিভিন্ন রঙের শত শত বস্তু দেখা যায়। এমন ব্যাক্তিকে হতভাগা ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে! নিজেদের স্বল্প জ্ঞান দ্বারা এরা সব বিষয়ের সমাধান করতে চাই যা কিছু বুঝতে অপারগ হয় তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। নিজেদের সীমাবদ্ধতা ও অপারগতার দিকে একটি বারের জন্যও দৃষ্টি দেয় না। এরা কেবল মুক্ত চিন্তার কথা বলে আর ইসলাম মুক্ত-চিন্তা ও মানব মস্তিষ্কের জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতার মাঝে সমন্বয় সাধন করে। আল্লাহ ﷻ একদিকে যেমন আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের অভ্যন্তরভাগে যা কিছু আছে তার উপর চিন্তা গবেষণা করার জন্য মানুষকে আহ্বান করে বলেন,

{وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [آل عمران: ১৯১]

﴿ তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে। ﴾

[আলে ইমরান/১৯১]

অন্য দিকে তাদের সীমাবদ্ধতার কথা স্বরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

{وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: ৮৫]

﴾তোমাদের খুব কমই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে﴿

[ইসরা/৮৫]

সুতরাং কোনো বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করার সময় সর্বদা নিজের সীমাবদ্ধতার কথা স্মরন রাখতে হবে। রসুলুল্লাহ ﷺ সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে বলেন,

{تفكَّروا في خلق الله ولا تفكروا في الله}

﴾তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করো আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা করো না।﴿

[জামিউল আহাদীস]

মুক্ত চিন্তা ও মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এই দুটি বিষয়ের মধ্যে যারা সমন্বয় সাধন করতে ব্যার্থ হবে তারা কখনও পথ প্রাপ্ত হবে না। একদল লোক আছে যারা কোনোরুপ চিন্তা ভাবনা না করেই সারাটা জীবন ভুল পথে চলে আবার এমন লোকও আছেন যারা সব বিষয়ে নাক গলানোর চেষ্টা করে এমনকি শেষে প্রশ্ন করে বলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করলো? [নাউযু বিল্লাহ্]। এটা স্মরন রাখতে হবে যে, না জেনে, চিন্তা ভাবনা না করে যেমন কোনো কাজ করা যাবে না একই ভাবে মানুষের মস্তিষ্ক

দিয়ে সব কিছু বোধগম্য হবেনা। সুতরাং নিজে না দেখলে বা না বুঝলেই যে কোনো কিছু অস্বীকার করতে হবে এমন নয়। বরং অভিজ্ঞ ও আস্থাভাজন ব্যাক্তির মতামতের দ্বারাও কোনো বিষয় প্রমানিত হয়। একইভাবে যে বস্তুটি দেখা যায় সেটির উপর চিন্তা গবেষণা করে না দেখা অনেক বিষয়ের উপর জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। সুতরাং শুধু দেখা বা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করাটাই জ্ঞান নয় বরং জ্ঞানী লোকের কথা অনুযায়ী চলা বা বোধ শক্তির মাধ্যমে একটি বিষয় হতে অন্যটির অস্তিত্ব অনুভব করাটাও জ্ঞান। আল্লাহ বলেন,

{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}

﴿ যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তুমি তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় শ্রবন শক্তি দৃষ্টি শক্তি ও বোধ শক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। ﴾ [ইসরা/৩৬]

আয়াতে দৃষ্টি শক্তির পাশা পাশি শ্রবণ শক্তি ও বোধ শক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যার অর্থ দৃষ্টি শক্তির মাধ্যমে যেমন জ্ঞান অর্জিত হয় শ্রবন শক্তি ও বোধ শক্তির মাধ্যমেও জ্ঞান অর্জিত হয়।

তাই নিজে না দেখে কিছু মেনে নেবো না এটা সঠিক নয়। বরং যে জানে এমন লোকের নিকট হতে শুনে অজানা অনেক বিষয় সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। একইভাবে যা দেখা যায় এমন বস্তুর উপর গবেষণা করেও অজানা অনেক বিষয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। নাস্তিকরা এই সাধারন বিষয়টিকেই অস্বীকার করে যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

আমরা উপরে পাঁচটি প্রশ্ন উল্লেখ করেছি যা নাস্তিকরা প্রায়ই করে থাকে। চিন্তা করলে দেখা যাবে এই গল্প গুলোতে নাস্তিকদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। পরবর্তী প্রশ্ন গুলোর উত্তরের জন্য আমরা আরো কিছু গল্প উল্লেখ করতে চাই। আল্লাহই তাওফীক দাতা।

(৪)

## জ্ঞানের অহংকারে অজ্ঞান হওয়া

## একজন নাস্তিক বিজ্ঞানীর গল্প।

সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পরই অপ্রিতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হলো। প্রায় ৫৫ বছর বয়সের ডাক পিয়নটির সাথে সাক্ষাত হয়ে গেলো।

- জনাব কাসেম, একটা চিঠি আছে।

বলতে বলতে হাতের চিঠিগুলোর মধ্যে দ্রুত হাত চালাতে থাকে বৃদ্ধ ডাক পিয়ন। চিঠির কথা শুনে নিজের অজান্তেই দাত কিটিমিটি করতে থাকে কসেমের। গত পাঁচ বছর ধরে প্রায় প্রতি সপ্তায় দু-একটি চিঠি আসে। অন্য কেউ নয় নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কারণে কলেজ জীবনে যে নাস্তিকটির সাথে পরিচয় হয়েছিল সেই গুণধর বন্ধুই সময়ে অসময়ে চিঠি পাঠিয়ে স্মরন করে কাসেমকে।

লোকটার নাম কালাচাঁন। সামান্য কিছু নাম ডাকের কারণে সবাই জনাব কালাচাঁন বলতে বাধ্য হয়। কেউ কেউ বলে কালাচাঁন স্যার। কালাচাঁন শব্দটির আগে পরে জনাব, স্যার ইত্যাদি শব্দ ভীষণ বেমানান লাগে। এই নামটা নিয়ে কাসেম অনেক ভেবেছে। চাঁদ কিভাবে কালো হয় সেটা তার নিকট বোধগম্য নয়। কালাচাঁনের কথা মনে হতেই কাসেমের মুখ কালো হয়ে যায়। লোকটি

দেখতে ভুতের মতো কালো হলেও মাথা মতলবের দিক থেকে মন্দ নয়। মাঝে মাঝেই নতুন নতুন আবিষ্কার করে জগৎবাসীর পিলে চমকে দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে সেসব আবিষ্কারের বেশিরভাগই হয়তো মাঝপথে থেমে যায় নয়তো কার্য ক্ষেত্রে অকার্যকর প্রমানিত হয়। এবারও নিশ্চয় তেমন কিছু ঘটেছে।

চিঠি পড়ে কাসেমের ধারণা সত্য প্রমাণিত হলো। এবারে নতুন একটি আবিষ্কার নাকি সত্যি সত্যিই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। বড় একটি ব্যবসায়ী গ্রুপ নাকি বহু টাকা দিয়ে আবিষ্কারটি কিনতে চেয়েছে। এই উপলক্ষে একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। সেই উৎসবে কাসেমকে নিমন্ত্রণ করার জন্যই এই অনাকাঙ্খিত চিঠি।

ব্যাপারটি কাসেমের নিকট একটু ভিন্নরকম মনে হয়। আবিষ্কার তো এর আগেও হয়েছে কিন্তু উৎসবের আমেজ তো তখন ছিল না তবে কি সত্যি সত্যিই এবার এই অকর্মার মস্তিষ্ক হতে কোনো কার্যকর ফর্মূলা বের হয়েছে? একটা সুপ্ত কৌতুহলের কারণেই কাসিম অনুষ্ঠানে হাজির থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

বুধবার সন্ধায় কালাচাঁনের বাড়ি হাজির হয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ স্বচক্ষে অবলোকন করার আগ পর্যন্ত কাসেম ব্যাপারটি নিয়ে সন্দিহান ছিল। বৈঠক খানায় পাতা চেয়ারগুলির উপর বেশ কিছু নামী দামী ব্যাক্তিকেও দেখা গেলো। একটা হল রুমকে আকর্ষণীয় কায়দায় সাজিয়ে অতিথীদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সারি বদ্ধ চেয়ার গুলির সামনে একটি উচু মঞ্চের উপর সিংহাসনের মতো যে আসনটি রয়েছে তার উপর বসে আছে মজলিসের মধ্যমনি বিজ্ঞানী কাঁলাচান। এই ঝলমলে পরিবেশে তাকে একটুকরো কয়লার মতোই মনে হচ্ছে। একজন ভাড়াটে উপস্থাপক অভিনেতার কায়দায় একনাগাড়ে মহাবিজ্ঞানী জনাব কাঁলাচানের প্রশংসা করে চলেছে। প্রশংসা করার মতো সমস্ত ভাষা ফুরিয়ে গেলে মজলিসের উপস্থিত নামী-দামী ব্যাক্তিদের একের পর এক মঞ্চে ডেকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হলো। দু'তিন জন লম্বা লম্বা বক্তব্য দিলো।

এই জাকজমক আর জমকালো পরিবেশ দেখে কাসেম তো অপ্রস্তুত হয়ে যায়। ঠিক কি মহামুল্যবান বস্তুটি আবিষ্কৃত হয়েছে তা জানার জন্য তার অন্তর আকুবাকু করতে থাকে। বক্তাদের বক্তব্য থেকেও কিছু বোঝা

গেলো না তারা যে যেভাবে পারছেন কেবল কালাচাঁনের প্রশংসা করছেন।

- তিনি সমগ্র মানবতার সেবাই আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, মানুষের কাজ কর্মকে সহজ করার জন্য নিত্য নতুন যন্ত্র তৈরী করতে অকান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন ইত্যাদি।

একজনের কথা থেকে যতটুকু অনুমান করা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে জনাব কাঁলাচান এবার যন্ত্রপাতির উপর একটানা ছয়মাস গবেষণা করে একটি ইঞ্জিন তৈরী করেছেন যা চলতে তেলের প্রয়োজন হবে না শুধু দুই লিটার পানি ভরে দিলেই দুইশ কিলো পথ নিশ্চিন্তে পার হওয়া যাবে। এই অভাবনীয় আবিষ্কারটি আজই একটি কম্পানির হাতে হস্তান্তর করা হবে। তারা বাজারে সরবরাহ করার যাবতীয় ব্যাবস্থা সম্পন্ন করবে। জনাব কাঁলাচানের সম্মান এবার হিমালয় পাহাড়কে ছাড়িয়ে যাবে।

বক্তব্য শুনতে শুনতে কাসেম বিরক্ত হয়ে যায়। এই বিরক্তি চরমে ওঠে যখন উপস্থাপক কাসেমকে মঞ্চে এসে কিছু বলতে অনুরোধ করে। নিজেকে তিরষ্কার

করতে করতে কাসেম মঞ্চ পর্যন্ত গমন করে। কাসেম কিছু বলার আগে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে। তার মানসিক অবস্থা এতটাই তিক্ত যে কথা বলেতে যেয়ে কালাচাঁনকে অপমান করার সম্ভবনাই বেশি। নিজেকে মোটামুটি স্থীর করে কাসেম বলতে আরম্ভ করে,

- পানি আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এই পানির মধ্যে জানা না জানা শত সহস্র রকমের গুনাবলী লুকিয়ে রেখেছেন। তিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে সর্বাধিক ও সাম্মক অবগত আছেন। তার জ্ঞান থেকে অতি সামান্যই মানুষকে দেওয়া হয়েছে। আমাদের উচিত তার কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং বড়াই না করা।

কাসেমের কথা শুনে কালাচাঁনের মুখ ম্লান হয়ে যায়। কাসেম কথা শেষ করলে পরবর্তী বক্তা হিসাবে কিছু বলার জন্য জনাব কালাচাঁনকে অনুরোধ করা হয়। সৌজন্য কথা বলার পরপরই কাঁলাচান তার বক্তব্যে অগ্নি বর্ষণ শুরু করে।

- এই মাহবিশ্বের কোনো ব্যাপারে কোনো সৃষ্টিকর্তার অবদান আমরা স্বীকার করিনা। এই মহা বিশ্বে কিভাবে কি ঘটে সে সম্পর্কে সকল গোপন তথ্য এখন আমরা

জানতে পেরেছি। মানুষ এখন পানিচক্র সম্পর্কে জানে। কিভাবে সমুদ্র থেকে পানি বাষ্প আকরে উপরে উঠে মেঘে পরিনত হয় পরে কিভাবে মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এসব এখন পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্রও বোঝে। মানুষের চোখ কিভাবে কাজ করে কয়েকদিন আগেও মানুষ জানতো না আজ সে রহস্যের সমাধান হয়েছে। এভাবে দিনের পর দিন প্রকৃতির বিভিন্ন রহস্যের জট খুলে যাচ্ছে। আমরা যা বুঝি যে সম্পর্কে জানি সে বিষয়ে কোনো সৃষ্টিকর্তাকে কেনো মানবো, কেনো বিশ্বাস করবো? ...............

কাসেমের মস্তিষ্ক গরম হয়ে যায়। এধরণের কথা শোনার জন্য সে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। আর এক মুহুর্ত এখানে বসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। চেয়ার থেকে উঠে হলরুমের বড় দরজাটির কাছাকাছি পৌছাতেই কারো ডাক শোনা যায়,

- জনাব কাসেম।

কাসেম পিছনে ফিরে তাকায়। প্রায় ত্রিশ বছর বয়সের একজন সম্ভ্রান্ত মানুষকে তার দিকে হেটে আসতে দেখে কাসেম অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে যায়। ভদ্রলোক কে, সি,

বি কম্পানির একমাত্র সত্ত্বাধিকারী ও মহাপরিচালক। এই কম্পানিটিই কাঁলাচানের প্রজেক্টটি কিনতে যাচ্ছে। সব কিছু ঠিকঠাক মতো সম্পন্ন হলে কালাচাঁন এবার কোটিপতি বনে যাবে। গুনি লোকের কদর করতে কে. সি. বি কম্পানির জুড়ি নেই। একটু কাছাকাছি এসে ভদ্রলোক বলেন,

- আগামী জুলাই মাসের ২ তারিখে নিঝুম হোটেলে আমাদের একটা অনুষ্ঠান আছে আপনি হাজির হলে খুশি হবো। কথাটি বলে ভদ্রলোক কাসেমের হাতে ঐ অনুষ্ঠানের প্রবেশপত্র তুলে দেন।

এর পরই মাইক্রফোন থেকে ডাক শোনা যায়,

- "কে. সি. বি" র মহাপরিচালক জনাব মীর হাশেমকে এখন কিছু বলতে অনুরোধ করছি।

ভদ্রলোক দ্রুত চলে যান।

কাসেম যখন হল রুম থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল তখন জনাব মীর হাশেম তার বক্তব্য শুরু করে দিয়েছেন। অপ্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলে নেওয়ার পর তিনি বললেন,

- আমাদের সাথে ডঃ কালাচাঁনের চুক্তির ব্যাপারটি

আপনাদের জানাতে চাই। আমরা তার আবিষ্কারটি বাজারজাত করতে চাই। এর জন্য পূর্ব শর্ত হলো কিছু দক্ষ লোক তৈরী করা যারা উক্ত যন্ত্রের উপাদান ও কার্যপ্রনালী সম্পর্কে বিস্তারিত জানবে। জনাব কালাচাঁন নিজে আমাদের লোকদের প্রশিক্ষনের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি বলেছি আমাদের লোকেরা মেধা ও অনুকরণের দিক থেকে বর্তমানে দক্ষতার শীর্ষে অবস্থান করছে। শুধু তার তৈরী পরীক্ষামূলক যন্ত্রটি হাতে পেলেই তারা সেটির উপর গবেষণা করে তার যাবতীয় গঠনপ্রনালী সম্পর্কে অবগত হতে সক্ষম। আমি শুধু চাই যন্ত্রটি আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। পরে অবশ্য আমরা তা ফেরত দেবো ...............

কাসেম বাড়ি চলে আসে। এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে যায়। কালাচাঁনের পক্ষ থেকে আর কোনো পত্র আসে না। এই বিষয়টি কাসেম আনন্দের সাথে উপভোগ করে। কাঁলাচানের পত্রের ভয়াল থাবা থেকে চিরোতরে মুক্তি পাওয়ার আনন্দ অকল্পনীয়। কিন্তু হঠাৎ একদিন বৃদ্ধ পিয়নকে আবার আসতে দেখে ভ্রু কুচকে যায় কাসেমের। তবে চিঠিটি হাতে নিয়ে অবাক

হতে হলো। এটা কাঁলাচানের পক্ষ থেকে আসেনি বরং জনাব মীর হাশেমের পক্ষ থেকে এসেছে। কাসেম খুব দ্রুত কাগজটিকে খামের বাইরে নিয়ে পড়তে শুরু করে,

- আপনাকে যে অনুষ্ঠানের দা'ওয়াত দিয়েছিলাম দুই দিন পর তথা আগামী ২ জুলাই সন্ধায় তা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। যদি প্রতিশোধ চান তবে মিছ্ করবেন না।

অনুষ্ঠানটির কথা কাসেম ভুলেই গিয়েছিল। চিঠিটি লেখা হয়েছে ৩০ শে জুন আর আজ দোসোরা জুলাই সেটা কাসেমের হস্তগত হয়েছে। অর্থাৎ আজ সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানটির আয়োজন হওয়ার কথা। সেদিন সন্ধ্যায় কাসেম নিজেকে প্রস্তুত করে নিঝুম হোটেলের দিকে যাত্রা করে।

কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হলো। এর পর কে, সি, বি কোম্পানির কয়েকজন পদস্থ ব্যাক্তি সংক্ষিপ্ত কথা বললেন। তারা বিগত সময়ের আগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করলেন। পরে মহাপরিচালক মীর হাশের কথা শুরু করলেন,

- জনাব কাঁলাচানের সাথে চুক্তির পর মেশিনটি

কোম্পানীর হস্তগত হয়। কোম্পানী দুজন সুদক্ষ বিজ্ঞানীকে যন্ত্রটি পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে নিয়োজিত করে। তারা খুব কম সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ যন্ত্রটির গঠন ও কাঠামো সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে। ইতিমধ্যে তারা বেশ কিছু যন্ত্র তৈরী করেছে সেগুলো বাজারে ছাড়া হয়েছে। মানুষের মাঝে এই যন্ত্রটির জনপ্রিয়তা সংক্রামক রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। মোটর গাড়ি, রাইস মিল, সেলো মেশিন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পানির মেশিনকে ব্যাবহার করে মানুষ অর্থ ও সময়ের অপব্যয় থেকে বাঁচতে পারছে। ইতিমধ্যে সাংবাদিকরা পত্র পত্রিকায় এটি নিয়ে লিখতে শুরু করেছে। তারা আমাদের নিকট এর আবিষ্কারকের নাম জানতে চেয়েছে আমরা ঐ দুজন মহান বিদ্যানের নাম বলেছি যারা কয়েকদিন মাত্র চিন্তা গবেষণা করে কাঁলাচানের তৈরী যন্ত্রটির আদি-অন্ত বুঝে ফেলেছেন। পত্র পত্রিকায় এই দুজন বিজ্ঞানীর নামও লেখা হয়েছে। দেশের জনগণ এখন তাদের নামে গান গাইছে। এই দুজন মহান বিজ্ঞানীকে বিশ্বের মানুষ কখনও ভুলবে না। ইতিহাসের পাতায় এদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কেবল দুই সপ্তাহ গবেষণা করে যারা এত জটিল একটি যন্ত্রের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ধারণা

লাভ করতে পারেন তারা নিশ্চয় অনেক বড় মাপের জ্ঞানী ব্যাক্তি। আমরা আজ এই দুজন বিজ্ঞানীকে প্রায় ৬ কোটি টাকার পুরষ্কার দেবো। আমি এই দুজন মহানপুরুষকে মঞ্চে উঠে আসতে অনুরোধ করছি।

দুজন সুদর্শন পুরুষকে ধীর কদমে উঠে আসতে দেখা গেলো। তাদের হাতে বিভিন্ন পুরষ্কার তুলে দেওয়া হলো। মহাপরিচালকের কথা অনুযায়ী তাদের এসব পূরষ্কারের মুল্য ৬ কোটি টাকা ।

কাঁলাচানের মুখ তখন আমাবশ্যার চাঁদের মতো কালো হয়ে গেলো। বন্য গাধা যেভাবে ছটফট করে কাঁলাচান সেভাবে ঝটাপটা করছিল। পুরষ্কার তুলে দেওয়ার পর দুজন বিজ্ঞানীকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হলো।

তারা সমস্বরে বললেন,

- এই পানি মেশিন সম্পর্কে আমরা এখন সব কিছুই জানি। মাত্র দুই সপ্তাহ গবেষণা করে আমরা এর যাবতীয় বিষয়াদি আত্মস্থ করেছি। আমরাই পুরষ্কার পাওয়ার বেশি হকদার। এটি কিভাবে কাজ করে, কিভাবে তৈরী করতে হয় সবই যখন আমরা জানি তখন এটা প্রথম যিনি তৈরী

করেছেন তাকে আমরা কেনো মূল্য দেবো? তার যে অধিকার আছে সেটা কেনো স্বীকার করবো? এই মেশিন সম্পর্কে তিনি যা জানেন আমরাও তা জানি।

বক্তাদ্বয় কথা শেষ করলে মহাপরিচালক অঢেল জনতার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন,

- এখন আমরা জনাব কাঁলাচানের পুরোনো যন্ত্রটি ফেরোত দিতে চায় এই যন্ত্রটি বাজারে বিক্রি করা সম্ভব নয় কারণ এটি দেখতে অনেকটা চালের কন্টেইনারের মতো। জনাব কাঁলাচান নিতান্তই অযত্নের সাথে বস্তুটি তৈরী করেছেন। তাছাড়া যখন যন্ত্রটি নেওয়া হয়েছিল তখনও ফেরত দেওয়ার ওয়াদা করা হয়েছিল। আমরা সে ওয়াদা পুরা করতে চাই। আমরা জনাব কালাচাঁনকে মঞ্চে উঠে আসতে অনুরোধ করছি।

কাঁলাচান কচ্ছপের গতিতে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলো। তার দুচোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিলো।

কে,সি,বি র মহাপরিচালোক পুরোনো যন্ত্রটি তার হতে তুলে দিয়ে বললেন,

- এই আনন্দঘন পরিবেশে আমরা জনাব কালাচানের

নিকট হতে কিছু কথা শুনতে চাই।

কাঁলাচান চোখ মুছতে মুছতে মাইক্রোফোনের দিকে এগিয়ে যায়। একহাতে মাইক্রোফন ধরে অন্য হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলতে থাকে,

- এই যন্ত্রটি আমি প্রথম আবিষ্কার করেছি, এটি আমিই তৈরী করেছি। আমি প্রথম যে যন্ত্রটি তৈরী করেছি সেটির উপর গবেষণা করে এরা দু-জন এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে। ওরা এখন এই যন্ত্রের সব কিছুই জানে। এই যন্ত্রের মতো হাজার হাজার যন্ত্র তৈরী করতে পারে। তাই বলে কি ওরা আমার থেকে শ্রেষ্ঠ? যে কোনো কিছু প্রথম তৈরী করে আর যে তৈরী করা জিনিসের উপর গবেষণা করে জ্ঞান অর্জন করে এদু'জন কিভাবে সমান হতে পারে? আমি এই অন্যায়ের বিচার চাই।

বহু কষ্টে কথাগুলো বলে চোখ মুছতে মুছতে অন্ধের মতো নিজের আসনে গিয়ে বসে কাঁলাচান।

মহাপরিচালক বলেন,

- আপনারা পানিচক্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন, কিভাবে পানি বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যায়, পরে সেই

বাষ্প জমে বরফ হয় পরে তা গলে বৃষ্টির আকারে আবার মাটিতে নেমে আসে এসবই আপনারা এখন জানেন। এভাবে বহু গবেষণার পর আপনারা প্রকৃতিতে ঘটমান অনেক সত্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন। চোখ কিভাবে দর্শন করে, মস্তিষ্ক কিভাবে কাজ করে, পৃথিবী, চাঁদ ইত্যদি গ্রহ উপগ্রহ কেনো সূর্যের চারিদিকে ঘোরে ইত্যাদি। কিন্তু আপনারা যখন জানতেন না তখনও কি এসব প্রকৃতির বুকে ঘটতো না? সেই স্রষ্টাকে কিভাবে অস্বীকার করেন যিনি আপনারা জানার পূর্বেই এসব সৃষ্টি করেছেন এবং সুনির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে তা পরিচালনা করে আসছেন? আপনারা তো তার সৃষ্টির উপর গবেষণা করেছেন মাত্র? তিনিই প্রকৃত প্রশংসার অধিকারী মহান রব। আর আপনারা মেধাবী চোরের মতো অন্যের আবিষ্কারের উপর গবেষণা করে অন্যায়ভাবে বড়াই করেন।

{اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [الروم: ১১]

আল্লাহই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন পরে আবার সৃষ্টি করবেন এবং তার দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তীত হবে।

﴾সূরা রুম/১১﴿

{بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}

[البقرة: ১১৭]

তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে শুন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন আর যখন কোনো কিছু করতে চান তখন শুধু বলেন হও আর হয়ে যায়।

﴾বাকারা/১১৭﴿

(৫)

## একজন নাস্তিকের ভুল স্বীকার

জনাব আলী হায়দার একজন অধ্যাপক। তিনি লেখা লেখিও করে থাকেন। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, বিজ্ঞান কল্প কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে লিখে থাকেন। হকাররা রাস্তায় বসে যেভাবে সর্ব রোগের সহজ চিকিৎসা প্রদান করে তিনিও সেভাবে সর্ব বিষয়ে কলম চালিয়ে থাকেন। লেখাটি কতটুকু মানসম্মত হলো সেটা তার বিবেচ্য বিষয়

নয় শুধু লেখার স্থানে স্থানে ইসলাম ও মুসলিমদের নামে কুৎসা রটনা করতে পারলেই তিনি সফল। উপরে উঠে আসার জন্য অন্যান্য লেখক বা কবিদের মতো তিনিও এই সহজ পদ্ধতিটি বেছে নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি “মধুর বিণা” নামে একটি মহাকাব্য রচনা করেছেন। এই কাব্য গ্রন্থটি অন্যান্য গ্রন্থ হতে আলাদা। আলী হায়দার সারাটা জীবনের অভিজ্ঞতা আর প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়ে এটি রচনা করেছেন। স্বীকার করতে হবে যে এর সাহিত্য ও ছন্দ বেজায় উঁচু মানের।

গ্রন্থটি কাগুজে পাণ্ডুলিপি হতে ইলেক্ট্রনিক অক্ষরে ছাপার পূর্বে আর একবার পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। জনাব আলী হায়দারের বয়স অনেক। একটানা বেশিক্ষণ অধ্যায়ন করতে পারেন না। ক্লাসের একজন মেধাবী ছাত্রকে বাসায় আমন্ত্রণ করে তার সামনে লেখাটি আগা-গোড়া পাঠ করার জন্য অনুরোধ করলেন। ছেলেটির নাম মাজাহার।

আলী হায়দার লোক বাছায় করতে ভুল করলেন। মাজাহার একজন ধার্মিক মুসলিম। আলী হায়দার তার লেখার মধ্যে যেসব অশালীন মন্তব্য করেছে মাজাহার

সেগুলো সহ্য করবে না এটাই স্বাভাবিক। এই যুবক যে তার কি ক্ষতি করতে পারে তখনও তা তার অজানা।

মাজাহার একজন নিষ্ঠাবান যুবক। প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে আলী হায়দারের বাড়ি আসে। “মধুর বিণা” হতে যতটুকু সম্ভব পাঠ করে শুনায়। একদিন পাঠ করার সময় একটি কবিতার কয়েকটি লাইন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সেখানে লেখা ছিল,

“ সৃষ্টিতে যা কিছু গোপন সুপ্ত

দৃষ্টি দিয়ে তা করেছি রপ্ত

অজানার পর্দা করেছি উন্মোচন।

স্রষ্টাকে আজ কিসের প্রয়োজন? “

এই লাইনগুলো পড়ার পর মাজাহার অধ্যাপকের নিকট এই লাইন কয়টির অর্থ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,

- আদিম যুগের মানুষরা প্রকৃতিতে ঘটমান ঘটনাসমূহের কোনো ব্যাখ্যা জানতো না। বিদ্যুৎ কেনো চমকায়, চাঁদ-সূর্যে কেনো গ্রহণ লাগে, আকাশ থেকে কিভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হয়........ সব বিষয়েই তারা ছিল অজ্ঞ। অজ্ঞতার

কারণেই তারা একজন পরাক্রমশালী স্রষ্টাতে বিশ্বাস করতো। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের অগ্রতির ফলে আমরা প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটে তার সঠিক ব্যাখ্যা রপ্ত করেছি। সব গোপন রহস্যের সমাধান সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এখন আর আমাদের সর্ব শক্তিমান মহা পরাক্রমশালী কোনো স্রষ্টাতে বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই। আমরা এখন স্বাধীন।

লোকটির কথা শুনে মাজাহারের শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়। অতি কষ্টে রাগ সংবরণ করে সে বলে,

- আপনি এই লাইন কয়টি আপনার গ্রন্থ্ হতে মুছে ফেলুন।

কথা শুনে আলী হায়দারের মুখ লাল হয়ে যায়। গর্ব আর অহংকারের স্বরে বলে,

- যদি তুমি প্রমাণ করতে পারো কথাটি ভুল তবে আমি তা বাতিল করবো।

মাজাহার বলে,

- আপনার গ্রন্থকে ভুল প্রমান করা আমার জন্য খুবই সহজ ব্যাপার কেবল এক দিনের জন্য গ্রন্থটি আমি বাসায়

নিয়ে যাবো সেটার আগা-গোড়া পাঠ করবো পরে আপনার সামনে এর ভুল ত্রুটি এমনভাবে উপস্থাপণ করবো যে আপনি নিজেই নিজের ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হবেন।

একজন নাস্তিকের যতটা নির্বোধ ও একগুয়ে হওয়া দরকার আলী হায়দারের মধ্যে তা পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। অহংকারে হুশ হারিয়ে তিনি বললেন,

- এক দিন নয় তোমাকে এক মাস সময় দিলাম তুমি এটা নিয়ে যাও, এটার ভুল প্রমাণ করো।

মাজাহার পাণ্ডুলিপিটি হাতে নিয়ে বের হয়ে গেলো। আলী হায়দার ঠোটের কোনে মৃদু হাসি নিয়ে অস্পষ্ট স্বরে বলে,

- আমার মুখ দিয়ে আমার ভুল স্বীকার করিয়ে নেওয়ার সাধ্য কার আছে?

তিনি সত্যিই বলেছেন। একজন নাস্তিকের মুখ দিয়ে ভুল স্বীকার করিয়ে নেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। যত যুক্তি প্রমাণই পেশ করা হোক ফু দিয়ে উড়িয়ে দেওয়াই তাদের অভ্যাস। তা না হলে কি আর কেউ স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে! আকাশে বাতাসে যার অস্তিত্বের

প্রমাণ রয়েছে তাকে যে অস্বীকার করে তার ভুল স্বীকার করিয়ে নেওয়া কঠিন ব্যাপারই বটে।

ঘটনার পর সপ্তাহ দুয়েক পর্যন্ত মাজাহারের দেখা পাওয়া যায় না। আলী হায়দার ছাত্রদের নিকট প্রশ্ন করেও কোনো তথ্য বের করতে সক্ষম হলেন না। এই প্রথম তার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। অজানা পরাজয়ের আশঙ্কা তার উপর ভর করলো। মাজাহার মেধাবী ছেলে সে ঠিক কি করবে বোঝা যাচ্ছে না। তবে কি সত্যি সত্যিই মাজাহারের নিকট তাকে পরাজিত হতে হবে? চিন্তার শেষে মৃদু হেসে মাথা নাড়েন,

- জয় পরাজয় তো আমার হাতে আমি যদি অস্বীকার করি তবে স্বীকার করিয়ে নেওয়ার সাধ্য কার আছে?

মনে মনে তিনি পণ করে ফেলেন মাজাহার যদি শত শত প্রমাণও হাজির করে তবু নিতান্ত তাচ্ছিল্লের সাথে তা তিনি অগ্রাহ্য করবেন। যেমনটি তিনি প্রায়ই করে থাকেন। এই তো কয়েকদিন আগে বোর্ডে একটি ইংরাজি শব্দ লিখতে ভুল করেছিলেন। ছাত্ররা সবাই প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন,

- অভিধান খুলে দেখো ওটা ঠিকই আছে।

অভিধান খুলে যখন দেখা গেলো শব্দটি আসলেই ভুল তখনও তিনি পরাজয় মেনে নেন নি। তিনি বলেছিলেন,

- অভিধান যারা ছাপে তাদেরও তো ভুল হতে পারে।

ছাত্ররা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। আর আলী হায়দারও সেই থেকে আজ পর্যন্ত শব্দটি ভুলভাবেই লিখে আসছেন। একজন খাটি নাস্তিক যেমনটি হয় তিনি তার চেয়ে কিছুমাত্র ভিন্ন নন। যুক্তি আর প্রমান দিয়ে তাকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। সে পথে চেষ্টা করলে মাজাহার নিশ্চয় ব্যার্থ হবে কিন্তু সে পথ ছাড়া মাজাহার আর কি পথই বা ধরতে পারে?

এটা বোঝার জন্য আলী হায়দারকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। ছুটির দিন সকালে সংবাদপত্রের একটি শিরোনাম দেখে হকচকিয়ে গেলেন। সেটি লেখা হয়েছে “মধুর বিণা” কাব্য গ্রন্থের ব্যাপারে। মাত্র ২২ বছরের একটি যুবক কিভাবে এতো বড়মাপের সাহিত্য কর্ম সম্পাদন করতে পারে সে ব্যাপারে দেশের সাহিত্যিক মহল ভীষণ বিশ্ময় প্রকাশ করেছে। যুবকের নাম

মোহাম্মাদ মাজাহারুল ইসলাম। গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়ার পর হতেই চারিদিকে রৈ রৈ পড়ে গেছে। বিভিন্ন মহল হতে এই মহাকবিকে সংবর্ধণা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। বড় বড় কবি সাহিত্যিকরা তাকে একবার হলেও দেখার জন্য তার বাড়ির সামনে ভিড় জমাচ্ছে ...........।

আলী হায়দার বেশি দূর পড়তে পারেন না। তার বুকের ভিতর হতে ভীষণ বেদনা উথলে ওঠে। এই প্রথম তিনি বুঝতে পারছেন মাজাহার তার কত বড় ক্ষতি করেছে। আলী হায়দার ভীষণ অস্থীর হয়ে উঠলেন। কয়েকজন বন্ধুর সাথে আলোচনা করে তার পান্ডলিপি চুরি করা হয়েছে মর্মে মামলা ঠুকে দিলেন। উভয় লেখককে বিচারের জন্য একত্রিত করা হলো। একজন বোধ সম্পন্ন লোক বললেন,

- কাব্য গ্রন্থটির বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে উভয় লেখককে প্রশ্ন করা হোক এই গ্রন্থ সম্পর্কে যার জ্ঞান বেশি তাকেই এর লেখক বলে ধরে নেওয়া হবে।

আলী হায়দার ফেসে গেলেন "মধুর বিণা" তার লেখা গ্রন্থ হলেও এর কোনো কিছুই তার মুখস্থ নেই। তার সৃতি

শক্তি খুবই দূর্বল। কয়েকটি কাবিতার দুয়েক লাইন বলতে পারবেন কিন্তু একটি কবিতাও সম্পূর্ণ বলতে পারবেন না। অপর দিকে মাজাহার মেধাবী ছাত্র এক মাসের মধ্যে গ্রন্থটি সে কয়েকবার পড়েছে। এর কোথায় কি আছে তার তার নখ দর্পণে। বেশ কিছু কবিতা আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত মুখস্থ রয়েছে।

এই পরীক্ষায় আলী হায়দার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। তার সারাটা জীবনের কষ্টার্জিত "মধুর বিণা" চিরকালের মতো তার হাত ছাড়া হয়ে গেলো। কোনোভাবেই তিনি এটাকে নিজের পরিচয়ে পরিচিত করতে সক্ষম হলেন না। শত সহস্র বছর ধরে মানুষ এটা আবৃতি করবে কিন্তু এর প্রকৃত লেখকের নাম জানবে না এটা তিনি কিভাবে মেনে নেবেন? আলী হায়দার নাওয়া খাওয়া ভুলে গেলেন তার চোখের ঘুম হারাম হয়ে গেলো। তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মৃত্যুর আগে শেষ বারের মতো মাজাহারের সাথে তিনি কিছু কথা বলতে চান। একদিন সন্ধ্যার পর তাকে মাজাহারের বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। তাকে দেখে আলী হায়দার আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। সবাইকে ঘর হতে বের হয়ে যেতে

বলে মাজাহারের নিকট কাকুতি মিনতি করে বললেন,

- কেবল একবার বলো তুমি ভুল করেছো, তুমি অন্যায় করেছো তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারবো।

মাজাহার বললো,

- আমি কোনো অন্যায় করি নি।

- তুমি কোনো অন্যায় করো নি? তুমি আমার লেখা চুরি করে নিজের নামে ছাপিয়েছো এটা অন্যায় নয়?

- না, অন্যায় নয়। এটা আপনিই আমাকে শিখিয়েছেন।

মাজাহারের কথা শুনে আলী হায়দার ভীষণ অবাক হয়ে বলে,

- আমি তোামকে শিখিয়েছি, কিভাবে?

- আপনি বলেছেন,

“ সৃষ্টিতে যা কিছু গোপন সুপ্ত

দৃষ্টি দিয়ে তা করেছি রপ্ত

অজানার পর্দা করেছি উম্মোচন।

স্রষ্টাকে আজ কিসের প্রয়োজন? “

আপনি যে কাব্যগ্রন্থটি লিখেছেন তাতে যা কিছু আছে সে বিষয়ে আমি যে আপনার চেয়ে বেশি জানি তা কি আপনি অস্বীকার করতে পারবেন?

আলী হায়দার মাথা নাড়েন। তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না। দুদিন আগেই তিনি হাতে নাতে তার প্রমাণ পেয়েছেন।

মাজাহার বলে,

- আল্লাহর সৃষ্টিতে গবেষণার দৃষ্টি ফেলে সকল গোপণ রহস্য উম্মোচন করেছেন একারণে যদি গর্বভরে স্রষ্টাকেই অস্বীকার করেন তবে আমিও বলবো আপনার রচিত “মধুর বিণা” বারবার পাঠ করে এর কোথায় কি আছে সে বিষয়ে আমি আপনার চেয়ে বেশি জ্ঞানী তাই এটা রচনা করতে আপনি যে শ্রম ও মেধা কাজে লাগিয়েছেন তা অস্বীকার করা আমার জন্য অন্যায় নয়। যদি আপনি আপনার কথাটির ভুল স্বীকার করেন তবে আমিও আমার ভুল স্বীকার করবো।

আলী হায়দার ব্যাপারটি বুঝতে পারেন। তার যুক্তি তার

উপর প্রয়োগ করে মাজাহার তাকে যে শিক্ষা দিয়েছে তাতে তিনি যুক্তিটির অসঙ্গতি ও অসাঢ়তা দারুণভাবে অনুভব করতে পারছেন। নিজের গর্ব-অহংকার আর আমিত্বকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে তিনি বললেন,

- ওটা একটা ভুলই বটে। একটা চরম ভুল। সৃষ্টির গোপণ রহস্য উম্মোচন করলেই স্রষ্টাকে অস্বীকার করা একটা ভ্রান্তি। বরং সৃষ্টি সম্পর্কে জানলেই তো স্রষ্টাকে চেনা যায়। তার সৃষ্টির মাধ্যমে তাকে অনুভব করা যায়।

পরের দিনই মাজাহার সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে জনাব আলী হায়দারকে "মধুর বিণা" র প্রকৃত লেখক হিসাবে ঘোষণা করে। আলী হায়দার দ্বিতীয়বার প্রকাশের আগে গ্রন্থটি আর একবার পর্যবেক্ষণ করে তাতে যা কিছু নাস্তিকতা ছিল তা কবরস্থ করেন। তিনি লেখেন,

"স্রষ্টা আছেন অচিন অজানা

সৃষ্টিতে পাবে তার ঠিকানা

প্রকৃতি রহস্যে জ্ঞান যার যতো

স্রষ্টার প্রতি হয় অবনত।

**মন্তব্যঃ**

................................

সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে কথা বললেই নাস্তিকরা বলে, আমরা সৃষ্টির কোন বিষয় কিভাবে সম্পাদন হয় সে বিষয়ে জানি। যেগুলো এখনও জানতে পারিনি তা নিকট ভাবিষ্যতে উন্মোচিত হবে। একারণে তারা সৃষ্টির ব্যাপারে স্রষ্টার কোনো অবদান স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় না। কিন্তু প্রকৃত কথা হলো কারো সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে পারলে তার অবদানকে অস্বীকার করতে হবে এটা যৌক্তিক নয় বরং তার সৃষ্টি সম্পর্কে যতো অধিক জানা যাবে ততই বেশি তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। যেহেতু তিনি এগুলো নিজ যোগ্যতায় সৃষ্টি করেছেন আর আমরা তার সৃষ্টির উপর চিন্তা গবেষণা করে ফলাফল বের করছি। যিনি কোনো কিছু প্রথম সৃষ্টি করেন আর যে সৃষ্ট বস্তুর উপর চিন্তা গবেষণা করে জ্ঞান অর্জন করে এরা উভয়ে কিভাবে সমান হতে পারে!

(৬)

## নাস্তিকতার বিড়ম্বনা।

মনিরামপুর সরকারী কলেজ। প্রশস্ত ভূখণ্ডের এদিক সেদিক অগোছালভাবে নির্মাণ করা হয়েছে পৃথক পৃথক কয়েকটি বহুতল ভবন। প্রতিটি ভবনের আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। একেবারে পশ্চিম দিকের ভবনটির নাম বিজ্ঞানভবন। সেই ভবনটির একটি ক্লাসে ছাত্রদের রসায়ন পড়াচ্ছিলেন আওলা স্যার। তার প্রকৃত নাম মোঃ আওয়াল হোসেন। এতদিন পড়াশুনা করে যে কয়টি সনদপত্র হাসীল করেছেন তার সবকটিতে এই নামই লেখা আছে। কিন্তু তিনি এই নামটি বদলে দিয়েছেন। প্রথমত নামটির প্রথমে মোঃ ও শেষের হোসেন অংশটুকু তার পছন্দ নয় কারণ তিনি একজন নাস্তিক দ্বিতীয়ত আওয়াল শব্দটি আরবী আর একজন নাস্তিক হিসাবে আরবী শব্দ তার ভাল লাগার কথা নয়। এককথায় নানাবিধ কারণে তিনি নিজের নাম পরিবর্তন করে

“আওলা” রেখেছেন। এই নামে ডাকলেই তিনি খুশি হোন নিজেকে এই নামেই পরিচয় দেন। জনাব আওলা ছাত্রদের পড়ানোর সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেন। রসায়ন পড়ানোর ফাকে ফাকে বিভিন্ন বিষয়ে গল্প গুজব করে রস আনয়নের চেষ্টা করেন। কিছুক্ষণ পাঠদানের পর তিনি ছাত্রদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন,

- তোমরা সবাই কি “আল্লাহ” তে বিশ্বাস করো?

ছাত্ররা যে যার মতো সম্মতি জানায়। তারা সবাই মুসলিম, দুএকজন কেবল হিন্দু আর বৌদ্ধ।

- তোমাদের মধ্যে কে কে মুসলিম হাত তোলো।

ক্লাসের প্রায় সবাই হাত তোলে। শুধু যে দু-তিন জন ভিন্নধর্মী ছেলে ছিল তারা হাত তোলে না। তারা উৎসুক দৃষ্টিতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।

আওলা স্যার মাথাটা ডানে বামে ঝাকিয়ে নিয়ে বলে,

- তোমাদের আমি একটি প্রশ্ন করি, আল্লাহ কি সব কিছু সৃষ্টি করতে পারেন?

ছাত্ররা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। কেউ কেউ অনুচ্চ

আওয়াজে হঁযাবোধক উত্তর দেয়।

যেনো সুযোগ পেয়ে গেছেন এমন ভঙ্গিতে আওলা স্যার বলে,

- তাহলে তিনি কি এমন একটি পাহাড় তৈরী করতে পারেন যা তিনি নিজেও নড়াতে পারবেন না। যদি বলো না তাহলে তো তিনি সব কিছু তৈরী করতে পারেন এই কথা মিথ্যা হয়ে যায় অর্থাৎ আল্লাহ্ অক্ষম প্রমানিত হয়ে যায় আবার যদি হ্যা বলো তাহলেও তিনি অক্ষম প্রমানিত হন যেহেতু তিনি পাহাড়টি নড়াতে সক্ষম নন। তাহলে তোমরা এখন কি উত্তর দেবে?

প্রশ্নটি করে আওলা স্যার ছাত্রদের মাথায় শেউলার জট পাকয় দিল। তারা বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা-গবেষণা করেও এর কোনো সমাধান বের করতে সক্ষম হলো না। কেউ কেউ বলল,

- আমরা এর উত্তর জানিনা ঠিকই কিন্তু মসজিদের ইমাম সাহেব নিশ্চয় বলতে পারবেন। আমরা আগামী কাল এর উত্তর জেনে আসবো।

ছুটির পর কয়েকজন উৎসুক ছাত্র এলাকার বরেণ্য

একজন আলেমের সাথে পরামর্শ করলে তিনি বললেন,

- শুধু উত্তর শুনিয়ে দিলে নাস্তিকদের বোঝানো যাবে না। তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে। এর জন্য অবশ্য তোমাদের কলেজের অধ্যক্ষের সাহয্যের প্রয়োজন হবে।

জনাব মহাসীন হক ঐ কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি একজন ধার্মিক মুসলিম। তার সাথে মওলানা সাহেবের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি সেদিনই কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে অধ্যক্ষের বাড়িতে গমণ করে তার সাথে পরামর্শ করলেন। কি করতে হবে তিনি তাদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

পরদিন কলেজে উপস্থিত হয়ে আওলা স্যার অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মূখীন হলেন। বিজ্ঞানভবনের সব ছাত্ররা ক্লাসের বাইরে প্রতিবাদ মিছিল করছিল। তাদের হাতে কাগজ ও কাপড়ের ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের ব্যানার ছিল তাতে লেখা ছিল,

“খুনির বিচার চাই,

আওলা স্যারের বিচার চাই”

ব্যানারে নিজের নাম দেখে অতিমাত্রায় সঙ্কিত হয়ে আওলা স্যার অধ্যক্ষের রুমে ঢুকে পড়লেন। কাঁপা গলায় বললেন,

- স্যার, এখানে কি হচ্ছে?

মহাসীন সাহেব তার দিকে তাকিয়ে ক্রোধ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন,

- তুমি খুনি। ছাত্ররা তোমার বিচার চাচ্ছে।

আওলা স্যারের মাথা এবার পুরো আওলিয়ে গেলো,

- আমি কাকে খুন করেছি, কখন খুন করেছি?

- তুমি গতকাল রাতে তোমার স্ত্রীকে খুন করেছো।

আওলা স্যার কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন,

- আপনি এ কি বলছেন? সকালে তার হাতের গরম ভাত খেয়ে আমি কলেজে আসছি সে তো সুস্থ শরীরে বিদ্যমান রয়েছে। তাকে আমি হত্যা করলাম কিভাবে?

মহাসীন সাহেব ঝাঝালো আওয়াজে বলেন,

- তুমি কি গত রাতে তোমার স্ত্রীর সাথে একই ঘরে ছিলে

না?

আওলা স্যার অবুঝের মতো হ্যা সূচক মাথা নাড়তে নাড়তে বিষয়টি কতদূর পর্যন্ত গড়ায় তা পর্যবেক্ষণ করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

এর মধ্যে জনাব মহাসীন উঁচু কণ্ঠে বলেন,

- তুমি কি ইচ্ছা করলেই তোমার স্ত্রীর মুখের উপর বালিশ চেপে ধরে বা অন্য কোনোভাবে তাকে হত্যা করতে পারতে না?

আওলা স্যার এবারও সম্মতি জানান। মহাসীন সাহেব সত্য বলেছেন। তিনি ইচ্ছা করলেই এটা করতে পারেন। টাকা পয়সা ওয়ালা একজন অলস মানুষ যতটা মোটা হতে পারে তিনি তেমন স্বাস্থের অধিকারী। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাথরের মতো ভারি। দুই হাতের তালু হাতির কানের মতো প্রশস্ত। অপরদিকে তার স্ত্রী রোগে শোকে আক্রান্ত জীর্ণ শীর্ণ একটা অবলা প্রাণী। বালিশের দরকার নেই শুধু নিজের হাত দুটি তার মুখের উপর মিনিট কয়েক ফেলে রাখলেই মশার মতো নিরবে তার মৃত্যু হবে। কেউ কিছুই টের পাবে না।

আওলা স্যারকে সম্মতি জানাতে দেখে মহাসীন সাহেব আবার বলেন,

- যেহেতু তুমি ইচ্ছা করলেই তোমার স্ত্রীকে হত্যা করতে পারতে তাই তুমি একজন খুনি, তোমার কঠিন শাস্তি হবে।

কঠিন শাস্তির কথা শুনে আওলা স্যারের বিশালায়তন দেহতে কম্পণ সৃষ্টি হয়। তিনি কাঁদো কাঁদো স্বরে বলেন,

আমি ইচ্ছা করলেই খুন করতে পারি শুধু এই কারণে আমাকে শাস্তি দেওয়া হবে? আমি আদৌ খুন করেছি কিনা তা দেখা হবে না? এটা কেমন বিচার?

মহাসীন সাহেব এবার হেসে ফেলেন। নিজের মাথাটি উপর হতে নিচে বারকয়েক ঝাকিয়ে নিয়ে বলেন,

- এটাই তোমার প্রশ্নের উত্তর। আল্লাহ ইচ্ছা করলেই এমন একটা পাহাড় তৈরী করতে পারেন যা তিনি নিজেই নাড়াতে সক্ষম নন এ থেকে তুমি দাবী করছো যে তিনি অক্ষম। তিনি আদৌ পাহাড়টি তৈরী করেছেন কিনা তা তুমি লক্ষ করছো না। শোনো, আল্লাহ ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারেন কিন্তু তিনি তা কখনও

করবেন না যেহেতু তা তার মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। যেমন জুলুম করা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, নিজের ক্ষমতায় কাউকে শরীক করা, সন্তান গ্রহণ করা ইত্যাদি কাজ তিনি ইচ্ছা করলেই করতে পারেন কিন্তু তিনি তা করবেন না কারণ এগুলো তার সম্মান ও মর্যাদার সাথে খাপ খায় না। একইভাবে তিনি এমন একটি পাহাড় তৈরী করতে পারেন যা তিনি নাড়াতে সক্ষম নন কিন্তু তিনি নিজেকে অক্ষম প্রমাণ করে এমন কোনো কাজ করবেন না। যেহেতু তিনি বর্তমানে এটা তৈরী করতে সক্ষম অতএব তিনি অক্ষম নন আবার যেহেতু এটা ভবিষ্যতে কখনই তৈরী করবেন না ফলে ভবিষ্যতেও তিনি অক্ষম হবেন না। তুমি কি তোমার উত্তর পেয়েছো?

আওলা স্যার এবার মাথা ঝাকাতে ঝাকাতে চেয়ারে এলিয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পেরেছেন। অন্তত স্ত্রী হত্যার বিচার মাথা পেতে মেনে নেওয়ার চেয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে নেওয়া তার জন্য বেশি উপকারী। যে সূত্রের কারণে আজ তিনি এই বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছেন তা পরিত্যাগ করতে তার নারাজ হওয়ার কথা নয়।

**মন্তব্যঃ**

............................

আসলে এখানে নাস্তিকরা যে যুক্তি পেশ করে তাতে একটি অসঙ্গতি রয়েছে। ঠিক কোন স্থানে অসঙ্গতি রয়েছে তা বুঝতে না পারার কারণে অনেকের মাথায় জট পেকে যায়। যুক্তিটির উপর থেকে নিচ পর্যন্ত তিনটি স্তর রয়েছে।

ক . আল্লাহ সব কিছু করতে পারেন।

খ . আল্লাহ এমন একটি পাহাড় তৈরী করতে পারেন যা তিনি নাড়াতে পারবেন না।

গ . তিনি অক্ষম যেহেতু তিনি পাহাড়টি নাড়াতে সক্ষম নন।

উপরের গল্পের মাধ্যমে বোঝা গেছে যে, এখানে একটি স্তর বাদ গেছে। যুক্তির ক্রমধারা আসলে এমন হওয়া উচিত ছিল,

ক . আল্লাহ সব কিছু করতে পারেন।

খ . আল্লাহ এমন একটি পাহাড় তৈরী করতে পারেন যা

তিনি নাড়াতে পারবেন না।

গ . আল্লাহ এমন একটি পাহাড় সৃষ্টি করলেন।

ঘ . তিনি অক্ষম যেহেতু তিনি পাহাড়টি নাড়াতে সক্ষম নন।

অর্থাৎ যখন পাহাড়টি আসলেই তৈরী করা হবে কেবল তখন আল্লাহ অক্ষম প্রমানিত হবেন কিন্তু যেহেতু তিনি এই ধরণের কাজ করবেন না তাই কখনই অক্ষম প্রমানিত হবেন না। শুধুমাত্র যুক্তির ভুল ব্যাবহারের কারণে এখানে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

{لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ}

﴾ আল্লাহ যদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন, তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বাছায় করতেন, তিনি পবিত্র। তিনি আল্লাহ, এক পরাক্রমশালী।﴿

[সূরা ঝুমার/৪]

অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলেই সন্তান গ্রহণ করতে পারতেন

কিন্তু তিনি এমন কাজ হতে পবিত্র। তিনি ইচ্ছা করলেই সন্তান গ্রহণ করতে পারেন এর উপর ভিত্তি করে বলা যাবে না যে তার সন্তান রয়েছে এবং তার শরীক রয়েছে। যদি তিনি সন্তান গ্রহণ করতেন তবে একথা বলা যেতো। সুবহানাল্লাহ!

একইভাবে তিনি নিজেই নাড়াতে সক্ষম নন এমন বড় পাহাড় তৈরী করতে পারেন কেবল এর উপর ভিত্তি করে বলা যাবে না যে তিনি অক্ষম যতক্ষণ না তিনি এমন একটি পাহাড় তৈরী করেন। কিন্তু তিনি এমন পাহাড় তৈরী করবেন না যা তাকে অক্ষম প্রমাণ করবে ফলে তিনি এখনও অক্ষম নন ভবিষ্যতেও কখনও অক্ষম হবেন না। সুবহানাল্লাহ!!!

(৭)

## তিনটি প্রশ্ন

বহু পূর্বে একজন মুসলিম সুলতান পাহাড়তলী নকে একটি জনপদ শাসন করতেন। তিনি সত্যপন্থী ও

ন্যায়পরাণ ছিলেন। নিজের ব্যাক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতেন। নিয়মিত জ্ঞান চর্চা করতেন, বড় বড় আলেম-ওলামাদের নিকট গমণ করে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। সুলতান নিজে নিঃসন্তান ছিলেন। তার পর তার কনিষ্ঠ ভাই জিল্লে জালালের ক্ষমতাসীন হওয়ার কথা ছিল। জিল্লে জালাল মানুষের নিকট সৎ লোক হিসাবে পরিচিত হলেও সুলতান তাকে কাছ থেকে দেখেছেন এবং নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন যে সে নেতৃত্বের অযোগ্য এবং বিলাশী ও সর্বভূক প্রকৃতির লোক। অপরদিকে সীদী আকবার নামে সুলতানের ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু ছিলেন। তিনি তার বংশের লোক না হলেও ন্যায় পরায়ন ও ধার্মিক ব্যাক্তি ছিলেন। সুলতান আমীর ওমরাদের সাক্ষী রেখে শাহী দফতরে একটি ওসীয়তনাম লিখলেন। তিনি লিখলেন,

“আমি নিশ্চিত জানি যে জিল্লে জালাল ক্ষমতা গ্রহণ করলে দেশে অন্যায় ও অনিষ্ট সৃষ্টি করবে তাই তার পরিবর্তে আমার একনিষ্ট বন্ধু সীদী আকবারকে আমার উত্তরাধিকার হিসাবে মনোনিত করে যাচ্ছি।”

এটা একটি অতি প্রশংসিত ও সাহসী পদক্ষেপ। এটাই

প্রমান করে যে সুলতান কতটা সত্যানুরাগী ছিলেন। যাই হোক, একদিন এই সুলতানের মনে কিছু প্রশ্নের উদয় হলো। নিজের বুদ্ধিতে চিন্তা গবেষণা করে তিনি প্রশ্নগুলোর সমাধান করতে সক্ষম হলেন না। প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তিনি স্থীর হতে পারলেন না। উজীর এবং মহামন্ত্রীকে তলব করে পাঠালেন তাদের নিকট সব কিছু খুলে বললে তারা একসূরে বললেন,

- এতো খুবই জটিল প্রশ্ন। আমাদের পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি বরং দেশের সকল আলেম ওলামাদের একত্রিত করে প্রশ্নগুলো তাদের সামনে উপস্থাপণ করুন।

এই পরামর্শ সুলতান পছন্দ করলেন। ঘোষক পাঠিয়ে রাজ্যে ঘোষণা করা হলো,

- সুলতানের নির্দেশ, আগামী ১৩ ই সফর জুম্মাবারে দেশের সকল আলেমদের শাহী মহলে একত্রিত হতে হবে। সুলতান তাদের তিনটি প্রশ্ন করবেন। যিনি উত্তর দিতে পারবেন তাকে রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হবে।

ঘোষণা শুনে আলেম-ওলামারা যে যার মতো প্রস্তুতি গ্রহণ করে জুম্মাবারে শাহী মহলে হাজিরা দিলেন। সুলতানের প্রাসাদে সেদিন উৎসবের আমেজ বিরাজ করছিল। একদিকে মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য রান্নাবান্না চলছিল অন্য দিকে মেহমানদের যেখানে বসার ব্যাবস্থা করা হয়েছিল সেখানে কিশোর ছেলেরা সূরেলা কণ্ঠে হামদ্ ও নাত্ গায়ছিল। কেউ কেউ কোরানের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে শুনাচ্ছিল। এসবের ব্যাবস্থা করা হয়েছিল যাতে মেহমানরা ক্লান্তি অনুভব না করেন। মাগরিবের সলাতের পর সুলতান মেহমানদের সামনে আসলেন। সম্ভাষণ ও সৌজন্যতার পর তাদের সামনে নিজের প্রশ্নগুলো পেশ করলেন,

১ . একজন পাপী যে পাপ কাজ করবে আল্লাহ তা আগে থেকেই লিখে রেখেছেন তাহলে যে পাপ কাজ করে তাকে দোষ দেওয়া হবে কোনো?

২ . যে যা কিছু আমল করে তা আল্লাহর ইচ্ছায়ই করে থাকে এমনকি একজন পাপীও আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো পাপ কাজ করতে পারে না তাহলে তাকে আল্লাহ শাস্তি দেবেন কোনো?

৩ . একজন পাপী যে পাপ কাজ করবে এটা যদি আল্লাহ আগে থেকেই জেনে থাকেন তবে তাকে সৃষ্টি করলেন কেনো?

প্রশ্নগুলো শুনে উপস্থিত আলেম-ওলামাদের হুশ হারানোর মতো অবস্থা হলো। তারা সবাই নিশ্চুপ ছিলেন। তাদের নিরাবতা দেখে সুলতান ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন,

- যদি এর উত্তর নাই দিতে পারেন তবে এত বছর ধরে অধ্যায়ন করে আপনাদের কি লাভ হলো?

পরিস্থিতির অবনতি হতে দেখে সালমান কোরেশী নামে একজন আলেম উঠে দাড়িয়ে বললেন,

- আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর আমার নিকট আছে।

সালমানের কথা শুনে সুলতান ভীষণ খুশি হলেন। সহাস্যে বললেন,

- আপনি দ্রুত উত্তর বলুন আমার কাতিব আপনার কথা লিখে নেবে।

সুলতানের অতি-আগ্রহ দেখে সালমান কোরেশী বললেন,

- উত্তর কানে শুনতে চান না চোখে দেখতে চান?

সুলতান অবাক হয়ে বললেন,

- চোখেই দেখতে চাই কিন্তু সেটা কিভাবে?

সালমান কোরেশী বললেন,

- আমাকে কিছুদিন সময় দিন।

সুলতান তাকে সময় দিতে রাজী হলেন। মেহমানরা সে রাত শাহী মহলে অতিবাহিত করে পরদিন যে যার বাড়ি চলে গেলেন।

এই ঘটনার পর একদিন সালমান কোরেশী একজন বৃদ্ধ মুসাফিরের ছদ্দবেশে রাজদরবারের মেহমান খানায় আশ্রয় নিলেন। প্রাসাদের প্রধান প্রহরীর সাথে যোগাযোগ করে তিনি সুলতানের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থণা করলেন। প্রধান প্রহরী সুলতানের অনুমতি পেয়ে মুসাফিরকে সুলতানের খাস কামরাতে নিয়ে গেলো। সৌজন্য আলাপচারিতার পর সুলতান প্রশ্ন করলেন,

- হে মুসাফির, আপনি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন?

সালমান কোরেশী এবার বলতে শুরু করলেন,

- মহামান্য সুলতান, আপনি কি আপনার ছোট ভাই জিল্লে জালালের পরিবর্তে সীদী আকবার নামে একজন অপরিচিত ব্যাক্তিকে উত্তরাধিকার হিসাবে মনোনিত করেছেন?

একজন অপরিচিত মুসাফির সুলতানের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার নিয়ে কথা বলছে দেখে সুলতান ভীষণ অবাক হন। মৃদু তালে মাথা নেড়ে মুসাফিরের কথায় সম্মতি দেন।

সুলতান হ্যাসূচক মাথা নাড়লে মুসাফির আবার শুরু করেন,

- জনাব, আমি একজন মুসাফির। দেশে দেশে ভ্রমন করা আমার কাজ। আপনার রাজ্যের প্রায় প্রতিটি স্থানে আমি গমন করেছি আর সব রকম লোকের সাথে মিশেছি। তাদের সবাই আপনার এই সিদ্ধান্ত অপছন্দ করছে তারা বলছে জিল্লে জালালই নেতৃত্বের বেশি যোগ্য। সে রাজ পরিবারের সন্তান। তাছাড়া সবাই তাকে নেককার বলেই মনে করে। তারা এও বলছে যে আপনি মৃত্যুবরণ করার পরই জিল্লে জালাল বিদ্রোহ করে সীদী আকবারকে

ক্ষমতাচ্যুত করবে।

মুসাফিরে কথা শুনে সুলতান আতকে ওঠেন। এধরণের খবর তিনি আগেও শুনেছেন। এটার বাস্তবতাও অস্বীকার করা যায় না। জিল্লে জালাল কেমন লোক তা রাজ পরিবারের সদস্যরা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। সাধারন মানুষ তাকে ভাল লোক বলেই মনে করে। তাছাড়া তার বংশ পরিচয় রয়েছে। এই সুযোগে সাধারণ মানুষকে দলে ভিড়িয়ে বিদ্রোহ করা তার জন্য খুবই সহজ। সীদী আকবারকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া অর্থ তাকে নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা। আবার এখনই জিল্লে জালালকে বন্দি করে বা হত্যা করে পথ পরিষ্কার করার সুযোগও নেই কারণ মানুষ বলবে বিনা অপরাধে সুলতান তাকে হত্যা করেছেন। সুলতান ভীষণ চিন্তিত হোন।

সুলতানকে চিন্তিত দেখে মুসাফির বলেন,

- আমার নিকট এই সমস্যার সহজ সমাধান রয়েছে।

সুলতান আগ্রহী হলে সালামন কোরেশী তাকে সমস্ত পরিকল্পণা খুলে বলে বিদায় হয়ে গেলেন। তার পরিকল্পণা সুলতানের পছন্দ হলো তিনি তার উজীর,

মহামন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতিকে ডেকে সব কিছু খুলে বললেন।

রাজ্যে ঢেরা পিটিয়ে ঘোষণা করা হলো,

- সুলতান বুরহানুদ্দিন তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জিল্লে জালালকে উত্তোরাধিকার মনোনিত করেছেন।

এই খবর দেশের কোনে কোনে পৌছে গেল। এটা একটি মৌখিক ঘোষণা ছিল মাত্র। শাহী দফতরের মূল ওসীয়ত নামা পূর্বের মতই বলবৎ ছিল।

এর পর একদিন সুলতান উজীর ও মহামন্ত্রীকে সাথে নিয়ে শিকারে বের হলেন। তারা ফিরতে দেরি করলে সৈন্যরা তাদের খুজতে বের হলো। গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে তারা দেখল উজীর ও মহামন্ত্রী সুলতানের রক্তাক্ত জামা হাতে নিয়ে অঝরে কাঁদছেন। ব্যাপার কি জানতে চাইলে তারা বললেন সুলতানকে বাঘে নিয়ে গেছে। সারা জঙ্গল খুজেও তারা কোনো মৃতদেহের সন্ধান পেল না। তারা ভাবল বন্য বাঘ সুলতানের শরীরের সম্পূর্ণ অংশই উদরস্থ্ করেছে।

এর পর পূর্বঘোষণা অনুযায়ী জিল্লে জালাল ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত হলো। সুলতান যেমনটি আশঙ্কা করেছিলেন তাই হলো। কয়েকদিন পরই জিল্লে জালালের প্রকৃত রুপ প্রকাশ হয়ে গেল। দেশের জনগনের সম্পদ আত্মস্বাদ করা, তাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করা ইত্যাদি মারাত্মক মারাত্মক অপরাধে দেশের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হতে লাগলো।

এসময় আসলে সুলতান গভীর জঙ্গলের কোনো একটি গুপ্ত স্থানে আত্মগোপন করে ছিলেন। তার নিকট রাজ্যের সকল খবরাখবর পৌছানো হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন আরেকটু সময় দাও, প্রজারা তাকে আরো স্পষ্টভাবে চিনে নিক। পরিস্থিতি যখন খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছিল তখন একদিন সাহসা সুলতান তার বিশ্বস্ত সৈন্যদের সাথে নিয়ে গুপ্ত স্থান হতে বের হয়ে আসলেন। উজীর, সেনাপতি, মহামন্ত্রী, সকলে তাকে স্বাগত জানিয়ে রাজ প্রাসাদে নিয়ে আসলো। তার নির্দেশে জিল্লে জালাল কে বন্দি করা হলো। যার যা কিছু অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল তা ফিরিয়ে দেওয়া হলো। দেশে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। সুলতান আবার সীদী আকবারকে নিজের উত্তরাধিকার মনোনিত

করে লিখলেন,

- আমি আগে থেকেই জানতাম জিল্লে জালাল ক্ষমতা গ্রহণের পর এমন ফাসাদ সৃষ্টি করবে কিন্তু তোমরা তা বুঝতে চাওনি তাই তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমি জিল্লে জালালকে স্থায়ীভাবে বন্দি রাখার আদেশ দিচ্ছি এবং সীদী আকবারকে আমার পরবর্তী সূলতান হিসাবে ঘোষণা করছি।

প্রজারা এবার সন্তোষ চিত্তে সুলতানের আদেশ মেনে নিল।

দেশে যখন পরিপূর্ণ স্থীরতা ও শান্তি ফিরে আসলো সে সময় একদিন সালমান কোরেশী মুসাফিরের ছদ্মবেশে আবারো রাজ দরবারে গমন করলেন। সুলতানের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাকে চিনতে পারলেন। সুপরামর্শ ও শুভকামণার জন্য তিনি মুসাফিরকে এক হাজার দিনার পুরষ্কার দিলেন এবং শাহী অতিথীশালায় কয়েকদিন অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করলেন। শাহী অতিথীশালায় আরো কয়েকদিন ছদ্মবেশে অবস্থান করার পর একদিন সালামান কোরেশী নিজের পরিচয় দিয়ে

বললেন,

- আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর নিয়ে এসেছি।

সুলতান তার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে বললেন,

- আল্লাহ আপনার জ্ঞান ও সম্মান বৃদ্ধি করুন আপনি দ্রুত বলতে শুরু করুন।

সালামান কোরেশী বললেন,

- আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ঘটনাটির মধ্যেই আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে।

সুলতান অবাক হয়ে বললেন,

- কিভাবে?

সালামান কোরেশী বললেন,

- আপনার প্রথম প্রশ্ন ছিল একজন পাপী যে পাপ কাজ করবে আল্লাহ তা আগে থেকেই লিখে রেখেছেন তাহলে যে পাপ কাজ করে তাকে দোষ দেওয়া হবে কোনো? জনাব, আপনি যখন সীদী আকবারকে উত্তরাধিকার হিসাবে প্রথম মনোনিত করেন তখন থেকেই শাহী

দফতরে লিখে রেখেছেন জিল্লে জালাল ক্ষমতাসীন হলে দেশে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করবে। পরবর্তীতে আপনি যেমন লিখে রেখেছেন তেমনই ঘটল এখন আপনি লিখে রেখেছেন এই কারণে জিল্লে জালাল যা কিছু করেছে তার দায়ভার কি আপনার উপর বর্তাবে?

সুলতান কিছুটা বিব্রত হয়ে বলেন,

- আমি আমার অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে এটা বুঝতে পেরেছিলাম তাই তা শাহী দফতরে লিখে রেখেছিলাম। এতে আমার দোষের কি আছে? আমি তো কোনো অন্যায় করিনি অন্যায় করেছে জিল্লে জালাল আর আমি রাজনৈতিক দুরদৃষ্টির মাধ্যমে আগেই জেনে ফেলেছিলাম যে সে এমন কিছু করবে আর সেই মোতাবেক লিখে রেখেছিলাম।

সালমান কোরেশী বলেন,

- প্রতিটি মানুষ কি আমল করবে আল্লাহ তা পূর্ব থেকেই জানতেন। তিনি যার সম্পর্কে যেমন জানতেন সেভাবে লিখে রেখেছেন। আপনি একজন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও যদি রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও পূর্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার কোনো কোনো বিষয়ে

জানতে পারেন তবে যিনি আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবী ও আকাশকে অস্তিত্বে এনেছেন তিনি একজন মানুষ কি আমল করবে তার সৃষ্টির পূর্বেই সে বিষয়ে জানতে পারবেন এটাই স্বাভাবিক। কারো ব্যাপারে পূর্ব থেকেই জেনে ফেলার কারণে কিছু লিখে রাখলে উক্ত কাজের দায়ভার যিনি লিখে রেখেছেন তার উপর বর্তায় না বরং উক্ত কাজ যে করলো সেই দোষী সাব্যস্ত হবে।

সূলতান ব্যাপারটি বুঝতে পারেন। অসম্ভব খুশি হয়ে বলেন,

- আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি?

সালমান বলেন,

- আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, পাপী যখন পাপ কাজ করে তখন আল্লাহর ইচ্ছাতেই তা করে থাকে তবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন কেনো? আমি আপনাকে বলবো, জিল্লে জালাল যা কিছু করেছে আপনার ইচ্ছাতে হয়েছে। আপনার আদেশেই তাকে ক্ষমতাশীন করা হয়েছে আপনি যে কোনো মুহূর্তে তাকে থামাতে পারতেন কিন্তু তা করেন নি এখন জিল্লে জালালকে আপনি বন্দি

করেছেন এটা কি অন্যায়?

সুলতান বলেন,

- আমি তো তাকে পর্যবেক্ষন করা এবং মানুষের নিকট তার প্রকৃত রুপ তুলে ধরার জন্য তাকে এই সুযোগটি দিয়েছি। আমি কেনো দোষী হবো?

সালমান কোরেশী বলেন,

- আল্লাহ্ পাপীদের পাপকর্ম প্রকাশিত করার জন্যই তাকে পাপ কাজের সুযোগ দেন। তাই সব কিছু তার ইচ্ছাতে হওয়া সত্বেও যে পাপ করে দোষী সেই হয় আল্লাহ্ নন।

সুলতান এবার আরো বেশি খুশি হন। সুলতানের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সালমান আবার বলেন,

- আপনার তৃতীয় পশ্ন ছিল, একজন পাপী যে পাপ কাজ করবে এটা যদি আল্লাহ আগে থেকেই জেনে থাকেন তবে তাকে সৃষ্টি করলেন কেনো? জনাব, গভীরভাবে চিন্তা করে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি আগে থেকেই জানতেন জিল্লে জালাল অন্যায় অবিচার করবে তবে তাকে ক্ষমতায় বসার সুযোগ দিলেন

কোনো?

সুলতান বেশ কিছুক্ষণ নিরব থেকে বলেন,

- আমি যখন নিশ্চিত বুঝতে পারলাম জিল্লে জালাল আমার অবর্তমানে ন্যায় ও ইনসাফ কে ধ্বংস করার জন্য মহা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে তখনই আমার ইচ্ছা হয়েছিল তাকে শাস্তি দেওয়ার। কিন্তু আমি তার সম্পর্কে যা জানি সাধারন মানুষ তা জানতো না। তখনই আমি তাকে শাস্তি দিলে মানুষ বলতো সুলতান বুরহানুদ্দিন তার নিজ ভাইকে বিনা অপরাধে শাস্তি দিয়েছেন। এমনকি সে নিজেও একই অভিযোগ করতো। কিন্তু এখন সবার নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়েছে যে আসলেই সে শাস্তির যোগ্য এমন কি সে নিজেও নিজেকে পাপী ও অপরাধী মনে করছে। তার অপরাধ তার নিজের নিকট এবং অন্যান্য মানুষের নিকট প্রকাশিত করার উদ্দেশ্যেই আমি তাকে ক্ষমতায় বসার সুযোগ দিয়েছিলাম।

সালমান কোরেশী মৃদু হেসে বলেন,

- যে পাপ করবে আল্লাহ তার সম্পর্কে প্রথম থেকেই জানতেন তার উপর তার ক্রোধ ও রাগ তখন থেকেই বিদ্যমান ছিল। তিনি তখনই তাকে শাস্তি

দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন কিন্তু যেহেতু তিনি ছাড়া অন্য কেউ এটা জানে না তাই যদি তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে স্বাধিনভাবে কাজ করার সুযোগ না দিয়েই শাস্তি দিতেন তবে সে বলতো আমার উপর অন্যায় অবিচার করা হচ্ছে। আল্লাহ তার পাপ প্রকাশিত ও প্রমানিত করার জন্যই তাকে সৃষ্টি করেছেন ও সুযোগ দিয়েছেন।

প্রশ্নের উত্তর শুনে সুলতান ভীষণ খুশি হন। খাজেনকে ডেকে বলেন,

- মওলানাকে আরো ১ হাজার দিনার পুরষ্কার দাও আর মাহমন্ত্রীকে ডেকে বলেন আজ থেকে সালামান আল কোরেশী এ রাজ্যের প্রধান বিচারক।

**মন্তব্যঃ**

......................

গল্পটির বিষয়বস্তু খুবই স্পষ্ট। এখানে নাস্তিকদের চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে তাকদীর সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সহজ সামাধান বর্ণনা

করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের জন্য জ্ঞানের রাস্তা খুলে দিন। আমীন।

(৮)

## নাস্তিকদের মস্তিষ্ক বিকৃতি।

পৌষ মাসের মাঝামাঝি একটি সকাল যেমন হতে পারে চারিদিকে তেমন পরিবেশই বিরাজ করছিল। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও এককাপ চা মুখে দেওয়ার জন্য হোসেনের চায়ের দোকানটির সামনে প্রায় জনা ত্রিশেক লোকের ভীড়। শীতের মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণে কেউ কোনো ত্রুটি করেনি, যে যার সাধ্যমতো মোটা কাপড় গায়ে চেপেই বাড়ি থেকে বের হয়েছে। তবে শীতের প্রকোপ এতটাই বেশি যে তা সকল প্রস্তুতিকে হার মানিয়ে মাংস আর চামড়া ভেদ করে সরাসরি হাড়ে গিয়ে বিঁধছে। চায়ের দোকানটির যে জাগাতে জনা দশেক লোক জটলা পাকিয়ে গল্পগুজব করছে তার অদূরেই একটি গাছে হেলান দিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে গোরবা বুড়ো। স্থানীয়

ভাষায় গোরবা মানে ভীনদেশী। এই বৃদ্ধ লোকটির নাম গোরবা হওয়ার ইতিহাস আছে । প্রায় বছর পাঁচেক আগে এক রাতে কাল বৈশাখী ঝড় হয়। সে ঝড়ে গ্রামের কোরো বাড়িই অক্ষত ছিল না। সকালে সবাই যখন বিধ্বস্ত গ্রাম ঘুরে ঘুরে দেখছিল তখনই একটি ঘরের পড়ে থাকা ছাউনীর নিচে বসে থাকতে দেখা যায় তাকে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তিনি এখানেই আছেন। কেউ তাকে খুঁজতে আসেনি তিনি নিজেও কথা বলতে পারেন না। গ্রামের লোক তাকে নিয়ে নানা কথা বলে। কেউ বলে,

- এ লোক আজন্মা বোবা,

কেউ বলে,

- দূর্যোগে সহায় সম্বল হারিয়ে শোকে বোবা হয়ে গিয়েছে হয়তো।

কোন এলাকায় তার বাড়ি এখানে কিভাবে আসলেন তা নিয়েও চলে জল্পণা কল্পণা কিন্তু এই বৃদ্ধ মানুষটার সঠিক পরিচয় কারো কাছেই নেই। তার নাম যে আসলে কি সেটাও অজানা। শুধু ভীনদেশ থেকে আসার কারণেই

মানুষ তাকে গোরবা বলে ডাকে। ঘটনা যাই হোক মানুষ তাকে অনেক শ্রদ্ধা সম্মান করে। লোক হিসাবেও তিনি খারাপ নন। প্রথমে কদিন খুব কষ্ট করেছেন। সারা দিন মাঠে ঘাটে ঘুরে ফিরে বেড়াতেন। সুযোগ পেলেই কৃষকদের হাতের কাজে লাগতেন বিনিময়ে দুপুরের খাবারটা তাদের সাথে ভাগাভাগি করে খেতেন আর যেখানে সেখানে মাথা গুজে রাত কাটাতেন। পরে আকবার আলী নিজের প্রয়োজন আর অসহায়ের প্রতি দয়াপরবশ গোরবা বুড়োকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন। প্রায় ডজন খানেক গরু আর গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশালায়তন চাষের জমি সামাল দেওয়ার জন্য তার বাড়ি সবসময় প্রায় ৭/৮ জন কৃষান খাটে। তার মতো লোকের পক্ষে দু-চারজন বাস্তুহীনকে আশ্রয় দেওয়া কোনো কঠিন কাজ নয়। সেই থেকেই বিশ্বস্ততার সাথে আকবার আলীর বাড়ি কৃষাণ হিসাবে থাকে গোরবা বুড়ো। আকবার আলী নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন। তার ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজন সবাই ধার্মিক মুসলমান।

গোরবা বুড়ো জড়ো সড়ো হয়ে গাছটিতে হেলান দিয়ে

বসে ছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল এ বেলা হয়তো আর উঠবেন না। কিন্তু তাকে এভাবে বসে থাকলে চলবে কি করে, তার তো অনেক কাজ। দুহাত উপরে তুলে শরীরটাকে ডানে বায়ে ঝাকিয়ে নিজেকে কাজের জন্য প্রস্তুত করে উঠতে যাবেন সে সময় আকবার আলী চায়ের দোকানে প্রবেশ করলেন। মমতার দৃষ্টিতে গোরবার দিকে একনজর তাকিয়ে চা ওয়ালাকে বললেন,

- এই হাসু, গোরবারে এক কাপ চা দে তো।

চায়ের কথা শুনে আবার নিজ স্থানে জেকে বসে বৃদ্ধ। চা হাতে পেলে পরম তৃপ্তির সাথে চুমুক দিতে থাকে।

এর মধ্যে হাজির হয় ভুতো । এর ভাল নাম চাঁন্দু। ছোট বেলায় একবার নাকি ভুতে পেয়েছিল সেই থেকে গ্রামের লোক বলে ভুতো। ভুতো ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। কয়েক ক্লাস লেখা পড়াও করেছে। বাবার ধন দৌলতের কারণে একসময় গ্রামের লোক ভুতোকে যথেষ্ট কদর করতো। তবে এখন সে সবার দুচোখের বিষ। শহরে লেখা পড়া করে ফিরে এসে সে আল্লাহ, রসুল নিয়ে খারাপ মন্তব্য করে। দু - ক্লাস লেখা পড়া করলেই ইসলাম নিয়ে খারাপ মন্তব্য করতে হবে এটা কেমন

কথা! আর কেউ কি লেখা পড়া করে নি! গ্রামেরই আরেক ছেলে রহীম তো শহরে পড়ে। সে তো ভুতোর মতো কথা বলে না! ভুতোর সাথে তার মাঝে মাঝে তর্কও হয়।

ভুতোকে হাজির হতে দেখে সবাই যে যার মতো বিরক্তি প্রকাশ করে। দোকানে আসা মাত্র ভুতো হাসুর কাছ থেকে এক কাপ চা নিয়ে এক স্থানে বসে হুস হুস করে পান করতে থাকে। মানুষ-জন তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যে যার গল্পে মন দেয়। এর মধ্যে হাজির হয় রহীম। রহীমকে আসতে দেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে আবার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এবার নিশ্চয় ভুতোর সাথে রহীমের তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে যাবে। ঠিক তাই হলো। রহীমকে দেখা মাত্র ভুতো বলে উঠলো,

- আচ্ছা রহীম, তুমি আমার সাথে কথা বল না কেনো? আমি কি তোমার কোনো ক্ষতি করেছি?

ময়লা আবর্জনার দিকে মানুষ যেভাবে তাকায় সেভাবে ভুতোর দিকে দৃষ্টি দিয়ে রহীম বলে,

- তোমার সাথে আমার কি কথা? তুমি তো একজন

নাস্তিক, আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করো না।

রহীমের কথাটি শুনে ভুতোর মুখে যেনো জুতো পড়লো। জোর করে মুচকি হাসার চেষ্টা করে বলল,

- তুমি কি বলতে পারো আল্লাহকে কেনো বিশ্বাস করতে হবে? কি কারনে তার গোলামী করতে হবে?

বহু কষ্টে রাগ সংবরণ করে রহীম বলে,

- কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। একবার নিজের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখো, কতো জটিল পদ্ধতিতে এই মানব দেহ ও এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। একজন সুকৌশলী স্রষ্টা ছাড়া এটা সৃষ্টি হওয়া কখনও সম্ভব নয়। দেখো তোমার হাতে যে চায়ের কাপটি রয়েছে যদি কেউ বলে এটি এমনি এমনি সৃষ্টি হয়েছে তবে কি তুমি তা মেনে নেবে? এই চায়ের কাপটি যদি এমনি এমনি সৃষ্টি না হতে পারে তবে তারচে বহু জটিল এবং অনেক বেশি রহস্যময় এই মানুষ কিভাবে এমনি এমনি সৃষ্টি হতে পারে? যারা এমন কথা বলে তারা কি পাগল নয়?

ভুতো মাথা নাড়ে।

- তুমি সত্য বলেছো বটে। এই সৃষ্টিরাজীর দিকে দৃষ্টি

দিলে সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্বের কথা স্বীকার না করে পারা যায় না। কিন্তু আর একটা প্রশ্ন আছে,

- আমি মেনে নিচ্ছি যে একজন স্রষ্টা এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন কিন্তু প্রশ্ন হলো যে স্রষ্টা এগুলো সৃষ্টি করেছেন তাকে কে সৃষ্টি করলো বা তিনি কিভাবে অস্তিত্বে আসলেন। এই প্রশ্নের উত্তর কি তুমি জানো?

রহীম বলে,

- আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এই আকাশ বাতাস সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা তাকে কেউ সৃষ্টি করেনি। তার সম্পর্কে আমরা এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না। আমরা শুধু তার কাজ সম্পর্কে জানি। তার আনুগত্য করার জন্য তার কাজ সম্পর্কে জানাটাই যথেষ্ট তার বিস্তারিত পরিচয় জানা শর্ত নয়।

ভুতো যেনো সুযোগ পেয়ে গেলো। ঠোট বাকা করে বলল,

- যার পরিচয় জানা যায় না তার কাজের কি মুল্য আছে?

ভুতো এই কথা গুলো বলার সাথে সাথেই রহীম কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলেছিল ঠিক সেসময় গোরবা চিৎকার করে উঠল। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাশে

গেড়ে রাখা বুক পর্যন্ত লম্বা বাসের খুটিটি তুলে নিয়ে দেহের সবটুকু শক্তি দিয়ে ভুতোর মাথায় আঘাত করলো। ভুতো বিকট চিৎকার দিয়ে অকুস্থলে কুপকাত হয়ে গেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত জনতা স্তম্ভিত হারিয়ে ফেলে। ভুতোর দুই ভাই সেখানে উপস্থিত ছিল তারা গোবরার দিকে পা বাড়ানোর সাহস না পেয়ে ভুতোর দিকে মনোযোগ দিল। তাকে টেনে হেঁচড়ে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেলো।

ঘটনার বেশ কয়েকদিন পর পর্যন্ত গ্রামে টান টান উত্তেজনা বিরাজমান ছিল। ভুতোর দু-ভাই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য গোরবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তবে গ্রামের প্রায় সবাই গোরবার পক্ষে ছিল। যা ঘটেছে তারা তেমন কিছুই চাচ্ছিল। সবাই সতর্ক করে দিয়ে বলল,

- গোরবার কিছু হলে কাউকে ছাড়া হবে না। যা হবার বিচারের দিন হবে।

এদিকে ভুতোর চিকিৎসা চলছিল। সে একটু সুস্থ হয়ে উঠলে ভাইদের সাথে পরামর্শ করে প্রেসিডেন্ট এর কাছে

অভিযোগ নিয়ে গেলো। তখনকার দিনে কয়েক গ্রামের উপর একজনকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হতো তাকে প্রেসিডেন্ট বলা হতো। সেসময় বেশিরভাগ মামলা মোকাদ্দমার ফয়সালা স্থানীয়ভাবেই করা হতো। কোর্ট বা থানা পর্যন্ত খুব কম মামলাই নেওয়া হতো। প্রেসিডেন্ট সাহেব বললেন,

- আপনারা ফিরে যান, আগামী শুক্রবার গ্রামে এর ফয়সালা হবে। আমি হাজির থাকবো।

প্রেসিডেন্ট সাহেবের কথায় তারা গ্রামে ফিরে আসলো।

শুক্রবারদিন যথা সময়ে প্রেসিডেন্ট সাহেব হাজির হলেন। ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ তখনো তিনি জানতেন না। গ্রামের মানুষের মুখে যখন সব কিছু শুনলেন তখন তিনিও ভুতোর উপর বেজায় চটলেন। মনে মনে নাস্তিককে যোগ্য শাস্তি দেওয়ার সংকল্প করে ফেললেন। ফয়সালা শুরু হলে চারিদিকের সাক্ষ্যে গোরবার অপরাধ প্রমানিত হলো। ভুতোর বাবা ও ভাইয়েরা বারবার অপরাধীর কঠিন শাস্তি প্রার্থনা করছিল। সাধারণ জনগণ নিরব ছিল। প্রেসিডেন্ট সাহেব এবার কথা শুরু করলেন,

- গোরবা যে বাঁশের লাঠি দ্বারা চান্দু ওরোফে ভুতোর মাথায় আঘাত করেছে এ কথা কি সত্য?

সাধারণ জণগন যে যার মতো মাথা নাড়লো। তারা কেউই মিথ্যা কথা বললো না।

প্রেসিডেন্ট সাহেব আবার কথা শুরু করলেন,

- ঠিক আছে। গোরবা যে, একাজ করেছে তা তো নিশ্চিত প্রমানিত হয়ে গেলো কিন্তু তার পরিচয় কি? সে কোথা থেকে এসেছে, কিভাবে এসেছে? এ সম্পর্কে তোমাদের কেউ কি কিছুই জানো?

সবাই নিরব থাকলো। আসলে তারা কেউ তার সম্পর্কে কিছুই জানে না। প্রেসিডেন্ট সাহেব ভুতোর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন,

- তুমি কি এসব প্রশ্নের উত্তর জানো?

ভুতো মাথা নাড়ে। অন্যদের মতো তারও গোরবার পরিচয়ের ব্যাপারে কিছুই জানা নেই। তার বাবার বয়সের লোকেরাই যখন গোবরার কোনো পরিচয় বলতে পারছে না তখন সে কিভাবে বলবে!

প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন,

- তবে তো তার কাজের কোনো বিচার হতে পারে না। যারা পরিচয় জানা নেই তার কাজের কি মূল্য আছে?

একথা বলে প্রেসিডেন্ট সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। সাধারণ জনগনের মধ্যে উৎসবের আমেজ পড়ে যায়। ভুতো থতোমতো খেয়ে বলে,

- হুজুর, তার কাজ যখন প্রমানিত হয়েছে তখন পরিচয়ের কি দরকার! যে, যা কাজ করে বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া না গেলেই কি সে তার প্রতিদান পাবে না?

প্রেসিডেন্ট সাহেব এবার তার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলেন,

- আল্লাহর এই সুবিশাল সৃষ্টিকর্ম ও এই অবদান নিজ চোখে দেখে প্রমান পাওয়ার পরও যারা তিনি কোথা থেকে আসলেন কিভাবে আসলেন এটা না জানা পর্যন্ত তার অবদানের স্বীকৃতি দিতে চায় না বা তার আনুগত্য করতে চায় না, তাদের মস্তিষ্ক কতখানি বিকৃত তা এবার কল্পণা করে দেখো! এই বিকৃত মস্তিষ্ক সোজা করার জন্য একটা আঘাত জরুরী ছিল গোরবা সেই কাজটিই করেছে সুতরাং তার এই কাজ অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না।

(৯)

## একজন ডাক্তারের আক্কেল সেলামী।

হোসেন মোল্লা একজন বয়ষ্ক ব্যাক্তি। গ্রামে তার বয়ষের কেউ বেঁচে নেই। তিনি একজন ধার্মিক ও সৎ স্বভাবের লোক। গ্রামের সকলে তার সুনাম করে। তার উৎফুল্য চেহারা আর সুস্থ সবল শরীর দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারবেন না যে তিনি নব্বইএর ঘরে পা দিয়েছেন। মানুষ তাকে দেখেই বিশ্ময় প্রকাশ করে। তিনি বলেন,

- সুস্থ্তা আল্লাহর নিয়ামত।

ইসলাম সম্পর্কে তিনি অগাধ জ্ঞান রাখেন। কেউ কোনো প্রশ্ন করলে তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন। এভাবে দিন-কাল ভালই কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার পায়ের পাতার উপরিভাগে ভীষণ বেদনা শুরু হয়। বহুদিন পূর্বে সেখানে একটি ছোট টিউমার দেখা দিয়েছিল। গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে সেটা বৃদ্ধি পেয়ে এখন আপেলের

আকৃতি ধারণ করেছে। ডাক্তাররা বহুবার অপারেশন করে ওটা কেটে ফেলার পরামর্শ দিয়েছে কিন্তু তিনি তাতে রাজী হন নি। এখন এমন জালা-যন্ত্রনা শুরু হলো যে অপারেশন করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় দেখা যাচ্ছে না। ছেলেরা তাকে একরকম বাধ্য করে একটি বেসরকারী ক্লিনিকে নিয়ে আসলো। একজন ডাক্তার কয়েকজন সহকারীসহ হোসেন মোল্লাহকে অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করছিল। নতুন লোক দেখলেই হোসেন মোল্লাহ তার সাথে আল্লাহ-রসুলের কথা বলার চেষ্টা করেন। হোসেন মোল্লা ডাক্তারকে বলেন,

- ব্যাটা, তুমি কি নামায পড়ো?

একটা সাদা হাত মোজা ডান হাতের ভিতর ঢুকাতে ঢুকাতে ডাক্তার বলে,

- চাচাজান, নামায কিসের জন্য পড়বো?

হোসেন মোল্লা এই ধরণের কথা শুনতে অভ্যস্ত নন। তিনি গ্রামে থাকেন, শহরের লোকেদের কতটা মতিভ্রম ঘটেছে সে বিষয়ে তার খবর না থাকারই কথা। তিনি কয়েকবার তওবা ইস্তিগফার পড়ে নিয়ে বলেন,

- সে কি কথা বাপু। আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তুমি তার জন্য নামায পড়বা না?

ডাক্তার বিভিন্ন কাজে ব্যাস্ত ছিল বেশি কথা বলার সময় তার হাতে ছিল না। কথা সংক্ষিপ্ত করার জন্য বলল,

- আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন তা তো বুঝলাম কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করলো, তিনি কোত্থেকে আসলেন এ প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তাকে মানতে পারবো না।

হোসেন মোল্লা বুদ্ধিমান লোক তিনি আর কথা বাড়ালেন না।

বেশ কিছুক্ষণ পর সফল অপারেশনের মাধ্যমে হোসেন মিয়ার পায়ের টিউমারটি সরিয়ে ফেলা হলো। অবস্থা মোটামোটি স্বাভাবিক হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি ক্লিনিকে অবস্থান করলেন। যখন মোটামোটি হাটাচলা করার মতো অবস্থা হলো তখন ছেলেরা তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে তিনি বললেন,

- ডাক্তারের সেলামী দিয়েছো?

বড় ছেলে বললো,

- আব্বা, সে চিন্তা আপনি কেনো করছেন?

হোসেন মোল্লা বললেন,

- সেলামীর টাকা আমার হাতে দাও। যাওয়ার আগে ডাক্তারের সাথে আমিই কথা বলবো তোমরা চুপ থাকবা।

বৃদ্ধ পিতার কথার অবাধ্য হওয়ার অভ্যাস ছেলেদের নেই। তাছাড়া তিনি কঠিন কোনো আদেশ করেন নি। ছেলেরা মাথা পেতে তার কথা মেনে নিল।

ডাক্তারের রুমে গিয়ে হোসেন মোল্লা বললেন,

- আমরা বাড়ি চলে যাবো।

কথাটি বলেই হোসেন মোল্লাহ ঘর থেকে বের হওয়ার মতো ভান করেন। ডাক্তারের পাশে সেসময় অন্য কেউ ছিল না তাই বাধ্য হয়ে নিজেই বলে,

- চাচা, আপনারা তো এখনও আমার সেলামী দেন নি।

হোসেন মিয়া ডাক্তারের দিকে ঘুরে বলেন,

- তোমার সেলামী কতো?

ডাক্তার মুখ কাচুমাচু করে বলে,

- মাত্র তিন হাজার টাকা।

হোসেন মোল্লা দৃঢ় কণ্ঠে বলেন,

- তুমি কিভাবে ডাক্তার হয়েছো আমাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তোমাকে আমি কোনো বিনিময় দেবো না।

কথা শুনে অন্য সবার সাথে সাথে ডাক্তারও ভীষণ অবাক হয়। এই বয়স্ক লোকটিকে তার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা বুঝিয়ে বলার মতো সময় বা ধৈর্য কোনোটিই তার নেই। তাছাড়া তিনি বললেই যে বৃদ্ধ লোকটি বুঝে ফেলবেন সে সম্ভাবনাও শুণ্যের কোঠায়। ডাক্তারি বিদ্যার অ-আ, ক-খ সম্পর্কেও যিনি কিছুই জানেন না একজন ডাক্তার কিভাবে ডাক্তার হয় তা তাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। নিজের অপারগতা স্বীকার করে ডাক্তার বলে,

- আমি কিভাবে ডাক্তার হয়েছি তা আপনাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া আমি কিভাবে ডাক্তার হয়েছি তা আপনার জানার কি দরকার? আমি যে আপনার চিকিৎসা করেছি সেলামী পাওয়ার জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয়?

হোসেন মোল্লা এবার সফলতার হাসি হেসে বলেন,

- আল্লাহ যে আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত করার জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয়, তিনি কোথা থেকে আসলেন কিভাবে আসলেন সেটা জানার কি দরকার?

বলতে বলতে হাতের টাকা ডাক্তারের টেবিলে ছুড়ে ফেলেন বৃদ্ধ হোসেন মোল্লা।

এবার নাস্তিক ডাক্তারের বোধ উদয় হলো। যে নাস্তিকতার কারণে নিজের সেলামীর টাকা আক্কেল সেলামী দিতে বসেছিলেন সেই নাস্তিকতাকে বারংবার অভিসম্পাত করতে করতে টাকাটা পকেটে ভরে নিলেন।

**মন্তব্যঃ** .................

আল্লাহকে মানার জন্য তার অবদানই যথেষ্ট তিনি কোথা থেকে আসলেন কিভাবে আসলেন এধরণের প্রশ্ন করা আমাদের জন্য শোভা পায় না। কারণ প্রথমত আমাদের জ্ঞান অতি অল্প আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করে কোনো সমাধানে পৌছানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আমাদের উপর তার অবদান সম্পর্কে জানাটাই যথেষ্ট তিনি কিভাবে বা

কোত্থেকে আসলেন এ বিষয়ে জানার কোনো প্রয়োজন নেই। এজন্য রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

﴿تفكَّروا فى خلق الله ولا تفكروا فى الله﴾

❮ তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করো আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা করো না। ❯

[জামিউল আহাদীস]

এই গল্পদুটির মধ্যে নাস্তিকদের শেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

---- (সমাপ্ত) ---